দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

৭৫ বর্ষ, ৮ সংখ্যা।। ২৪ অক্টোবর, ২০২২।। ৬ কার্তিক - ১৪২৯।। যুগাব্দ - ৫১২৪।। দীপাবলী সংখ্যা।। website : www.eswastika.com

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

দীপাবলী বিশেষ সংখ্যা

৭৫ বর্ষ ৮ সংখ্যা, ৬ কার্তিক, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

২৪ অক্টোবর - ২০২২, যুগাব্দ - ৫১২৪,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

দুর্নীতির চুল্লিতে পুড়ছে রাজ্য আর বীণা বাজাচ্ছেন মমতা □ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় □ ৬

জেলে শিক্ষা, বাজারে চাকরি □ সুন্দর মৌলিক □ ৭

কংগ্রেস জোড়ো না ভারত জোড়ো, ব্যাপারটি কী? □ গিনেস ভার্নিয়ার্স □ ৮

বাঙ্গলার মা, বাঙ্গালির কালী □ শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী □ ১১

ভারতে শক্তিসাধনার বিকাশ □ কৃষ্ণচন্দ্র দে □ ১৪

ভূত চতুর্দশী ও কিছু কথা □ অমিতলাল ঠাকুর □ ১৬

'মা কালীর তবিলদারি' নিয়েও তিনি হিন্দুদের মধ্যে ভেদজ্ঞান দূর করেছিলেন □ কল্যাণ গৌতম ও সৌকালিন মাঝি □ ২৩

ভারতীয় ধর্মসাধনার ইতিহাসে অবতারবরিষ্ঠ যুগপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ □ নন্দলাল ভট্টাচার্য □ ২৬

সপ্তমবর্ষীয়া কন্যারূপে পূজিতা হন মা করুণাময়ী □ নিখিল চিত্রকর □ ২৮

মা কালীকে কেন কলকাত্তাওয়ালি বলা হয় □ বরুণ দাস □ ৩১

শক্তি সাধনায় দুর্গাই হবেন কালী—জয় মা কালী, জয় বাঙ্গালি □ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী □ ৩৩

শূন্যর বয়স কি মাত্র দু' হাজার বছর! □ দুর্গাপদ ঘোষ □ ৩৭

কাঁসারিবাজার প্রামাণিক বাড়ির চারশো বছরের প্রাচীন কালীপুজো □ সপ্তর্ষি ঘোষ □ ৪৩

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ অন্যরকম : ৪৫

—ঃ প্রচ্ছদ পরিচিতি ঃ—

টালিগঞ্জের শ্রীশ্রী করুণাময়ী মায়ের ছবিটি প্রচ্ছদে ব্যবহৃত হয়েছে

প্রকাশিত হবে
৩১ অক্টোবর
২০২২

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে
৩১ অক্টোবর
২০২২

প্রয়াত কেশবজী ও শ্যামলালদার স্মৃতিচারণ

এক মারাঠি যুবকের বাঙ্গালি হয়ে ওঠা। দীর্ঘ ৭২ বছর বঙ্গভূমিতে তাঁর পদচারণা। সুদক্ষ সংগঠক, অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। অসংখ্য যুবকের মনে দেশভক্তির স্ফূরণ ঘটিয়েছেন— তিনি সঙ্ঘ প্রচারক কেশবরাও দীক্ষিত।

তাঁরই প্রেরণায় আর এক উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালি যুবকের প্রচারক ব্রত গ্রহণ। তিনি শ্যামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। দুজনই সদ্য প্রয়াত।

আগামী সংখ্যায় এই দুজনের স্মৃতিচারণ করবেন গুণমুগ্ধ স্বয়ংসেবকরা।

দাম ষোলো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

With Best Compliments from :-

A

Well Wisher

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

কালীপূজায় অলক্ষ্মী বিদায় সর্বাগ্রে

ভারতবাসী বিশেষ করিয়া বাঙ্গালি হইল শক্তির উপাসক। মা দুর্গার আরাধনার পর তাহারা মা কালীর আরাধনায় ব্রতী হয়। কার্তিকের মহাঅমাবস্যা তিথিতে তাহারা মহাকালীর পূজায় মগ্ন হয়। মা দুর্গাই মা কালী। দেবী মাহাত্ম্যের প্রথম অধ্যায়েই মহাকালীর স্তুতি রহিয়াছে। মা দুর্গা চণ্ড-মুণ্ড অসুরদ্বয়কে বধ করিবার নিমিত্ত মহাকালী রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। দুষ্ট, মায়াবী ও কুটিল শক্তিকে ধ্বংস করিবার জন্য মা মহামায়ার মহাকালী রূপ ধারণ। বৈদেশিক আক্রমণে যখন ধর্ম ও সমাজ বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে তখন এই দেশের রাজা মহারাজারা শক্তির আরাধনা করিয়া সেই আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছেন। ইংরেজ শাসনকালে দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচনের জন্য বীর বিপ্লবীরা মা কালীর সামনে রক্ততিলক পরিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেন। বিপ্লবীরা নিজেদের নিকট মা কালীর চিত্র রাখিতেন। বিপ্লবীরা আখড়ায় আখড়ায় কালীপূজা করিতেন। এই রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিপ্লবীদের প্রবর্তিত কালীপূজা আজও সমান উৎসাহে সম্পন্ন হইতেছে। শুধু বঙ্গপ্রদেশেই নহে, সমগ্র ভারতবর্ষে শক্তি আরাধনা সমানভাবে হইয়া থাকে। পাকিস্তানের কালাত শহরে দেড়হাজার বৎসর ধরিয়া সমান উৎসাহে কালীপূজা সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে।

কালীপূজা বা তাহার পূর্বের দিনটিতে সমগ্র ভারতবাসী দীপাবলী উৎসবে মাতিয়া ওঠেন। শুধু ভারতেই নয়, ত্রিনিদাদ-টোবাগো, মায়ানমার, মরিশাস, গায়ানা, নেপাল, সিঙ্গাপুর, সুরিনাম, মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা ও ফিজিতেও দীপাবলী সমান উৎসাহে পালিত হইয়া থাকে। ধীরে ধীরে সমগ্র বিশ্বেই এই আলোর উৎসব জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে দীপাবলীর দিন সরকারি ছুটির প্রস্তাবও উঠিয়াছে। বস্তুত, দীপাবলী হইল অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে শুভ শক্তির জয়ের নিমিত্ত আনন্দোল্লাস। লঙ্কা বিজয় করিয়া শ্রীরামচন্দ্র এই দিনে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে স্বাগত জানাইবার জন্য অযোধ্যবাসী সমগ্র নগরীকে আলোকমালায় সজ্জিত করিয়াছিলেন। ষষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দজীকে মোগল কারাগার হইতে মুক্ত করিবার স্মরণে শিখ সম্প্রদায় দীপাবলী পালন করিয়া থাকেন। ভারতবাসীর বিশ্বাস, এইদিনে স্বর্গের দেবতারা মর্ত্যবাসীর গৃহে আসেন তাহাদের আশীর্বাদ দানের নিমিত্ত। দেবতাদের বরণ করিবার নিমিত্ত মর্ত্যবাসী তাহাদের ঘর-বাহির আলোকমালায় সজ্জিত করিয়া রাখেন। মর্ত্যবাসীর মনের আকুতি—'দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি আকাশে প্রদীপ জ্বালি।'

দীপাবলী বা কালীপূজার মহাক্ষণে বঙ্গপ্রদেশের বহু স্থানে লক্ষ্মীপূজারও আয়োজন করা হইয়া থাকে। অমাবস্যার রাত্রিতে লক্ষ্মীপূজার আয়োজনের তাৎপর্য হইল, অলক্ষ্মী বিদায় করা। বর্তমান প্রেক্ষিতে বঙ্গপ্রদেশে অলক্ষ্মী বিদায়ের অনুষ্ঠানটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আজ বঙ্গজীবনের সর্বত্র অলক্ষ্মীর প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে। অলক্ষ্মীর প্রাদুর্ভাবে এই রাজ্য নৈরাজ্যে পরিণত হইয়াছে। লক্ষ্মীপূজার দিন কলকাতা শহরেই হিন্দুর ঘরের লক্ষ্মী আক্রান্ত হইয়াছে। ধন-সম্পদ লুণ্ঠিত হইয়াছে। মা-বোনের সম্ভ্রম হানি ঘটিয়াছে। অলক্ষ্মীর শাসন-প্রশাসন নির্বিকার। অলক্ষ্মীর নেতা-মন্ত্রীরা এই রাজ্যের শিক্ষিত মেধাবী যুবক-যুবতীদের মেধা চুরি করিয়া তাহাদের প্রাপ্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। সর্বত্র চুরি ও লুঠের বাড়বাড়ন্ত। এই রাজ্যে মূর্তিমান অলক্ষ্মী। এমতাবস্থায় মহাশক্তির আরাধনার দিনে, আলোর উৎসবের দিনে অলক্ষ্মী বিদায়ের ব্যবস্থা না করিলে সবই যে নিষ্ফল হইবে, তাহা সর্বাগ্রে বুঝিতে হইবে। অলক্ষ্মীর রাজত্ব কায়েম রহিলে মহাকালীপূজা, মহালক্ষ্মীপূজা ও দীপাবলীর আয়োজনে বাঙ্গালির ভাগ্য ফিরিবে না।

সুভাষিতম্

যদিচ্ছসি বশীকর্তুং জগদেকেন কর্মণা।

পরাপবাদসস্যেভ্যঃ গাং চরন্তি নিবারয়।।

যদি কোনো একটি কাজে জগৎকে বশীভূত করতে হয়, তবে পরনিন্দারূপী ধানখেতে বিচরণকারী জিহ্বারূপী গাভীকে তাড়িয়ে দিতে হবে।

দুর্নীতির চুল্লিতে পুড়ছে রাজ্য আর বীণা বাজাচ্ছেন মমতা

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

সাধের রোম নগরী পোড়ার সময় নীরো রাজা বীণা বাজাচ্ছিলেন। এটা রূপক না সত্য ইতিহাসবিদরাই জানেন। তবে পশ্চিমবঙ্গ এখন দুর্নীতির চুল্লিতে পুড়ছে। নীরোর বদলি সেজে উৎসবের বীণা বাজাচ্ছেন বিরোধীদের 'দুর্নীতি রানি' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পুজো কার্নিভালকে তারা বলছেন 'চোরনিভাল'। মমতা আঁচের নতুন বলি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সোনালী চক্রবর্তী ব্যানার্জি আর খানিকটা ভারতের ক্রিকেট গৌরব সৌরভ গাঙ্গুলি। সোনালীর পুনর্নিয়োগ বেআইনি বলে খারিজ করেছে আদালত। সৌরভ ধোঁয়ার বাদশা। আকৃতির নাগাল পাওয়া দুষ্কর। ক্রিকেট বোর্ড তাঁকে ছেঁটে দিয়েছে। কি করবেন 'দেবা না জানন্তি, কুত্রাপি মনুষ্যা'। আমার ধারণা রাজনীতি ছাড়া তাঁর গতি নেই।

দেশের কাজ তিনি কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রী হিসেবে ব্যবহৃত হতেই পারেন। অনেকে বলছেন নভেম্বরে ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার কর্ণধার হতে পারেন। আর তা হলে সৌরভ সেই স্থান পূরণ করবেন। সৌরভ অবশ্য বলেছেন অন্যত্র আরও বড়ো কাজে লিপ্ত হবেন। অন্যত্র বা কাজটা কী তা বলেননি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আকাদেমি তৈরি করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'বিশ্বগুরু ভারতের' স্বপ্নের সাথী হওয়া। ২০২৩ ফেব্রুয়ারির আগে সৌরভের ভবিষ্যৎ নির্দিষ্টভাবে জানা যাবে না। মন্ত্রী হলে নিয়মানুসারে ছয় মাসে মধ্যে তাঁকে মনোনীত বা নির্বাচিত হয়ে আসতে হবে। ঘরের মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তাতে কিছু বলার থাকবে না। এক ঢিলে দু'পাখি মারবেন সৌরভ। যেমন মেরেছিলেন বাম জমানায় সিপিএম নেতা অশোক ভট্টাচার্যের হাত ধরে। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সাহচর্যে।

দীর্ঘদিন সরকার চালিয়ে কমিউনিস্ট সিপিএমের মাথায় অক্সিজেন যাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ৩৪ বছরের মধ্যেই তাদের মৃত্যু হয়। স্বাধীনতার পর প্রথম ৩০ বছরে কেন্দ্রে কংগ্রেসের এই দশা হয়েছিল। স্বৈরাচারী সিপিএম শাসনের বদলি মুখ তৃণমূল। তার অর্ধেক রাস্তায় পৌঁছনোর আগেই নিজেদের দুর্নীতি আর মুর্খামিতে মুড়ে ফেলেছে তৃণমূল।

আগামীতে আবার কোন মূর্খের দল রাজ্য চালাতে আসবে তা নিয়ে আমার আশঙ্কা আর সংশয় দুটোই রয়েছে। যে ধরনের বোকামি আর অসৎ কাজের বাতাবরণ মমতা জমানায় এ রাজ্যে তৈরি হয়েছে তার থেকে নিস্তার পাওয়া মোটেই সহজ নয়। প্রধানভাবে মুখ্যমন্ত্রী যখন তাতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মদত জোগাচ্ছেন। সৌরভ নিয়ে মুখ খোলেননি মমতা। মমতা যেটা জানেন না সেটা নিয়ে অনেক কিছু বলেন। যেমন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, ভগিনী নিবেদিতা বা ঋষি অরবিন্দ। যেটা জানেন তা নিয়ে কিছু বলেন না। যেমন উপরাষ্ট্রপতি ভোটে জগদীপ ধনকড়ের বিরোধিতা না করা বা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা বিষয় সাংবাদিকদের মুখোমুখি না হওয়া ইত্যাদি।

চীৎকার করে রাজ্যের মানুষকে জাগিয়ে রাখার জন্য কিছু অপ্রাসঙ্গিক মুখপাত্রকে রেখে দিয়েছেন মমতা। সৌরভকে ঘিরে বাঙ্গলার মানুষের অনেক অযৌক্তিক আবেগ রয়েছে। মমতা জানেন সে আবেগে হাত না দেওয়াই ভালো। বঙ্গ বিজেপিকে ব্যাকফুটে ঠেলতে সৌরভের বঞ্চনাকে বাঙ্গলার বঞ্চনা হিসেবে তুলে না ধরাই ভালো। সাংকেতিক শব্দ ব্যবহার করে বেআইনি চাকরি দিতেন শিক্ষা পর্ষদ সভাপতি মানিক ভট্টাচার্য। সাংকেতিক শব্দ 'ডিডি' 'আর কে' পাওয়া গিয়েছে তার মোবাইলে। বিরোধিরা বলছেন 'ডিডি' মানে 'দিদি' এবং 'আর কে' মানে পুলিশ কর্তা রাজীব কুমার যিনি গায়েব হয়ে গিয়েছেন মমতা বদান্যতায়। 'ন্যায্য চাকরি দিতে সাংকেতিক শব্দ কেন ব্যবহার হবে? তাহলে সে সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতা কতটুকু?' মমতার সাঙ্গোপাঙ্গরা লুকিয়ে ছুপিয়ে বেআইনি কাজ করতেন। সব জেনেও মমতা চোখ বুজে থাকতেন। যে রাজা জেগে ঘুমিয়ে থাকার ভান করে সে মৃত। তৃণমূলের অন্তঃকোঁদল ব্লক স্তরে পৌঁছেছে। ফলে আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটে বিজেপি প্রার্থী পেয়ে যাবে। বিধানসভার তিক্ত অভিজ্ঞতা নজরে রেখে বিজেপির রাজ্য নেতারা তাতে সায় দেবে কি না আমার সন্দেহ রয়েছে। তৃণমূলের এক জাঁদরেল নেতার কথায় 'এই মুহূর্তে আসন পিছু পাঁচজন করে প্রার্থী। একজন পেলে বাকি চারজন বিক্ষুব্ধ। তার মধ্যে একজন নিষ্ক্রিয় হবে আর বাকি তিনজন বিরোধী শিবিরে যোগ দেবে'। জাতীয় কংগ্রেসের সংস্কৃতিতে ভরা তৃণমূল খেয়োখেয়ি আর দুর্নীতির দল। তাই হিমশিম খাচ্ছেন মমতা। তবে বুঝছেন তৃণমূল দলের শুরু আর শেষ তাঁর হাত ধরেই হচ্ছে। ইংরেজিতে যাকে বলে 'ফ্রম ক্রেডল টু গ্রেভ'— শৈশবের দোলনা থেকে কবরস্থান' পর্যন্ত। মমতা বোধহয় দ্বিতীয় ধাপ দেখতে পাচ্ছেন। তাই উৎসবের বাতাবরণ তৈরি করে সব ভুলে থাকতে চাইছেন। নজর ঘুরিয়ে দিতে চাইছেন। তবে পারবেন বলে মনে হয় না। ▯

জেলে শিক্ষা, বাজারে চাকরি

চাকরি বিক্রেতাযু দিদি,

আপনি সত্যি দেখিয়ে দিলেন। কীভাবে জলে নেমেও আঁচল না ভিজিয়ে থাকা যায় তা দেখিয়ে দিলেন। কিন্তু আপনার কথায় যাঁরা জলে নেমেছিলেন তাঁরা সকলেই ডুবন্ত। দুর্নীতির সাগরে ডুবন্ত। ভাবা যায় দিদি! ভারতের ইতিহাসে যা কখনও হয়নি তাই হয়েছে বাঙ্গলায়। এ সবই আপনার কৃতিত্ব। প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত প্রায় সবাই জেলে। আপনার আমলে যাঁরা চাকরি বিক্রি করেছিলেন সেই মন্ত্রী থেকে সান্ত্রী জেলে। এখনও জেলের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে অনেকে। হ্যাঁ, দিদি আপনি যেটা জানেন সেটাই ঠিক। আইএএস, আইপিএস কর্তাদের দুর্নীতি যোগও সামনে এসে গিয়েছে।

তবে দিদি আজকে এলেবেলে চাকরি বিক্রি নিয়ে নয়, উচ্চপদের চাকরি বিক্রি নিয়ে কিছু কথা লিখতে চাই। এই যেমন ধরুন রাজ্যের মুখ্যসচিব। কিংবা দেশের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ। সবেতেই দুর্নীতির চরম উদাহরণ। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জেলে গিয়েছেন। তাঁর জায়গায় আপনি বসিয়ে দিয়েছেন আপনার বশংবদ এক রাজনীতিককে। বাঙ্গলার ইতিহাসে এমন নজির নেই। ওমপ্রকাশ মিশ্র হতে পারেন অধ্যাপক কিন্তু ওঁর প্রথম পরিচয় একজন দলবদলু রাজনীতিক।

সে যাই হোক। প্রথমে আসি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কথায়। প্রথমে কলকাতা হাই কোর্ট এবং পরে সুপ্রিম কোর্টও বলে দিয়েছে ওই নিয়োগ বেআইনি। অবৈধ ভাবে ওঁকে দেশের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষপদে বসানো হয়েছিল। ওঁর একটাই যোগ্যতা আপনার কাছে বিবেচিত হয়েছিল যে, আপনার বশংবদ আমলা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী তিনি। সোনালী চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায় এখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রয়েছেন। কিন্তু কোন্ মুখে আছেন বলতে পারেন? দেশের সর্বোচ্চ আদালত যাঁর নিয়োগকে বেআইনি বলে দিয়েছে। আপনার দর্পচূর্ণ হয়েছে সেই নির্দেশে। কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার পড়ুয়া কী ভাবছে বলুন তো? ওই উপাচার্যের চেয়ারে কত মনীষী বসেছেন অতীতে। আর আজ সেখানে কিনা অবৈধ পথে পদ পাওয়া সোনালী দেবী!

এই প্রসঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপকের কথা এখানে তুলে ধরছি। তিনি লিখেছেন, লজ্জা থেকেই লিখেছেন। 'গোটা ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চরম লজ্জা বোধ করার কথা। বর্তমান আইনবিধি দ্রুত পালটে ফেলে, তাকে লঙ্ঘন করে, ভুল যুক্তি দর্শিয়ে উদ্দেশ্য সাধনের যে বিকৃত পন্থা রাজ্য সরকার ব্যবহার করেছে, তা অতিশয় উদ্বেগজনক।' একটি নিবন্ধে তিনি আরও লিখেছেন, 'এই ঘটনা থেকে একটা বড়ো শিক্ষা নেওয়ার আছে বইকী। পদ্ধতি বস্তুটি যে কত গুরুত্বপূর্ণ, তা সম্ভবত বর্তমান ভারতে, এবং পশ্চিমবঙ্গে, বিস্মৃত হতে বসেছে। উপযুক্ত পদ্ধতি-অনুসারী না হওয়ার ফলে সঙ্গত সংশোধনও করা যায় না। বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রচলিত প্রথা বা আইনের পাশ কাটিয়ে কিংবা তাকে অগ্রাহ্য করে চলার যে প্রবণতা আপাতত এ রাজ্যে সর্বত্র বিরাজমান— কৃষি, একশো দিনের কাজ থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা— সব ক্ষেত্রেই তা রাজ্যবাসীকে একটা সঙ্কট-পরিস্থিতিতে এনে ফেলছে। বিষয়টি গুরুতর। আইনি পথে চলা এবং প্রয়োজনে বৈধ পথে আইন সংশোধনে অগ্রসর হওয়া— এর কোনও বিকল্প নেই, থাকতে পারে না। গায়ের জোরে বিকল্প তৈরি করে নেব, এমন যাঁরা ভাবছেন, তাঁরা ভুল করছেন। এই ভাবনা বিপজ্জনক তো বটেই, ক্ষেত্রবিশেষে বুমেরাংও, দেখাই যাচ্ছে।'

> **অবৈধ পথে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চরম লজ্জা বোধ করার কথা। বর্তমান আইনবিধি দ্রুত পালটে ফেলে, তাকে লঙ্ঘন করে, ভুল যুক্তি দর্শিয়ে উদ্দেশ্য সাধনের যে বিকৃত পন্থা রাজ্য সরকার ব্যবহার করেছে, তা অতিশয় উদ্বেগজনক।**

এবার আসি সোনালীদেবীর স্বামী আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে। আলাপন বর্তমানে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (এটিআই) কর্ণধার এবং মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য পরামর্শদাতা। গত বছর কলাইকুণ্ডায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বৈঠকে পুরো সময় থাকার বদলে আপনার সঙ্গে রাজ্য সরকারের কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। যা আইনত তিনি পারেন না। কিন্তু আপনার প্রতি তাঁর আনুগত্য প্রকাশ বেশি গুরুত্ব পায় আলাপনের কাছে। তাঁর বিরুদ্ধে কেন্দ্র শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগের প্রক্রিয়া শুরু করায় আলাপন কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ট্রাইবুনালের (ক্যাট) কলকাতা বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। পরে তা দিল্লিতে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল কেন্দ্র। কেন্দ্রের সঙ্গে আইনি লড়াইয়ে আলাপনকে আইনি সহায়তা দিচ্ছে রাজ্য। এই মামলায় বেশ কয়েক বার আলাপনের হয়ে আদালতে দাঁড়িয়েছিলেন বিখ্যাত আইনজীবী তথা তৃণমূল সাংসদ অভিষেক মনু সিংভি। যিনি প্রতিবার শুনানিতে নেন ২৫ লক্ষ টাকা। প্রতিবারই তাঁর সেই 'ফি' মিটিয়েছে রাজ্য। সেই খাতে এখনও পর্যন্ত খরচ হয়েছে কয়েক কোটি টাকা।

ধন্য দিদি, বাঙ্গলা ধন্য। কে বলেছে এই রাজ্যের অভাব চলছে! □

অতিথি কলম

গিলেস ভারনিয়ার্স

কংগ্রেস জোড়ো না ভারত জোড়ো ব্যাপারটা কী?

রাহুল গান্ধীর পাঁচ মাস ব্যাপী ভারত জোড়ো যাত্রার উদ্দেশ্য তাঁর মতে কংগ্রেস ভারতবাসীর কাছে এক একাত্মতার বার্তা দেবে এবং একই সঙ্গে ধুঁকতে থাকা কংগ্রেস দলকে নতুন করে উদ্দীপনা দেবে। এই যাত্রায় সোনিয়া গান্ধীও কর্ণাটকে যোগ দিয়েছেন।

সত্যি বটে, নির্বাচনের পর নির্বাচনে নির্মম পরাজয় এবং একই সঙ্গে ছোটো বড়ো নানা মাপের কংগ্রেস নেতার অবিরত দলত্যাগ দলের মধ্যে এক ডামাডোল সৃষ্টি করেছে। বাস্তবিক কংগ্রেস কর্মীদের এখন মানসিকভাবে চাঙ্গা করা এবং তাদের ওপর বড়ো নেতাদের নজর দেওয়া নিতান্তই জরুরি। কিন্তু ২০১৪ সালের পর থেকে রাজনীতির ক্ষেত্রে কংগ্রেস বিশ্বাসযোগ্যতা ও জনগণের মধ্যে প্রভাব যেভাবে হারিয়ে চলেছে এ যাত্রা কি তা পুনরুদ্ধার করতে পারবে?

কেন্দ্রে ৮ বছর বিজেপি সরকার থাকার ফলশ্রুতিতে কংগ্রেস এখন দুটি রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী রাখতে পেরেছে। হিসেব অনুযায়ী তাদের সারা ভারতে বিধায়ক সংখ্যা এখন সর্বকালীন নিম্ন সংখ্যা ৬৯০ ছুঁয়েছে। ২০১৪ সালের আগে যা ছিল ১২০৭। দল তৃণমূল স্তরে ভয়াবহ ভাবে তাদের সংগঠন হারিয়েছে। কেননা একই সঙ্গে বহু নির্বাচনে লড়া প্রার্থী, পুরনো নেতা ও নীচুতলার কর্মীরা দল ছেড়ে অন্য দলে যোগ দিয়েছে, অনেকে আবার রাজনীতিই ছেড়ে দিয়েছে।

পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে—

(১) ২০১৪ সাল থেকে (উপনির্বাচন-সহ) ৬৪ জন পূর্ব কংগ্রেস নেতা অন্য দলের টিকিটে লড়েছে। এর মধ্যে ২০১৪ সালে ৪১ জন আর ২০১৯-এ ২৩ জন।

(২) এই একই সময়ে বিভিন্ন রাজ্যে ৫৫৩ জন নির্বাচিত কংগ্রেস বিধায়ক ও ১৩৪ জন নির্বাচনে পরাজিত কংগ্রেসি দলত্যাগ করেছেন। এদের সকলেই অন্য কোনো বেশি সম্ভাবনাময় জায়গায় নিজেদের ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়েছেন। এর মধ্যে ২৩৩ জন জিতেছেন বিভিন্ন দলের হয়ে যার মধ্যে শুধু বিজেপির টিকিটেই জিতেছেন ১০৭ জন।

(৩) এই পরিসংখ্যান কেবলমাত্র সেই সমস্ত রাজনীতিবিদকে নিয়েই করা হয়েছে যারা অতীতে কংগ্রেস ছত্রছায়ায় নির্বাচন লড়েছিলেন। এর মধ্যে সংগঠন পরিচালক বা নীচুতলার কর্মীদের হিসেব ধরা হয়নি, কেননা সে সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান নেই। এই পরিপ্রেক্ষিতে 'ভারত জোড়ো' যাত্রা পরিস্থিতি কতদূর পরিবর্তন করতে পারবে তা এখনও পরিষ্কার নয়। ক্ষয় কতটা রোখা যেতে পারে সেটাই মূল বিচার্য। এই যে একটি যাত্রা বা যা ইংরেজিতে প্রসেশন মানুষের মনের ওপর তাৎক্ষণিক একটি আবেগ, প্রতিক্রিয়া বা ভাবনার সৃষ্টি অবশ্যই করে। কিন্তু একেবারে নীচের তলায় যেখানে দলগত কর্মীরা কাজ করেন যেখানে দূরদর্শিতা, কৌশল ও নানান নির্বাচনী হিসেব নিকেশের দরকার হয়। সেই কারণে এই ধরনের সাংকেতিক রাজনীতি আর তৃণমূল স্তরের হাতে-কলমে নির্বাচনী রাজনীতির মধ্যে বিস্তর ফারাক। বিশেষ করে যে সমস্ত রাজ্যে কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে সরাসরি লড়াই হয়।

(৪) বিগত দুটি কেন্দ্রীয় নির্বাচনে কংগ্রেস বিজেপি ২০০টির কাছাকাছি আসনে মুখোমুখি লড়াই করেছিল। সংখ্যাটি ছিল ২০১৪-তে ১৮৯ এবং ২০১৯-এ ১৯০। ২০১৪-তে ১৬৬টি এবং ২০১৯-এ ১৭৫টি আসনে বিজেপি জয় পায়। হিসেবে দেখা যায় কংগ্রেস-বিজেপি সরাসরি লড়াইয়ের ক্ষেত্রে বিজেপি দশের মধ্যে নয় আসন জিতেছে। এই ধরনের চোখে আঙুল দেওয়া সাফল্য একটা বিষয়ই প্রমাণ করে— সাংগঠনিক দক্ষতা ও বুঝে তার সফল প্রয়োগ। দু'দলের মধ্যে এই ফারাক বা খামতি জয় করাই বিচার্য বিষয়। দেখা গেছে, বহু জায়গায় কংগ্রেস সংগঠন ক্ষয়ে যাচ্ছে। অনেক জায়গায় তা একেবারে ধসে গেছে। অন্যদিকে, বিজেপি ভারতের নির্বাচনী রাজনীতিতে দেখা সর্বকালীন সেরা মজবুত সংগঠন অধিকাংশ রাজ্যে তৈরি করেছে। বিজেপির কর্মীরা গ্রাম ও শহরাঞ্চলে নিবিড় প্রচার চালায়--- যাদের সর্বদা সাহায্য করে সঙ্ঘ বিচারধারার বিভিন্ন শাখা সংগঠন। এই সংগঠনগুলি একটি স্থায়ী গণমাধ্যম হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে। এরা কেবলমাত্র নির্বাচনী সময়ে নয়, সর্বদাই মানুষের মধ্যে যোগাযোগ ও খবরাখবর নিয়ে নিজেদের, একই সঙ্গে দলের ভাবমূর্তি দীর্ঘস্থায়ী করেন। এখন এর সঙ্গে যোগ হয়েছে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সামাজিক মিডিয়ায় যোগাযোগ স্থাপন এবং এ কাজে পর্যাপ্ত অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা। এই মাটির সঙ্গে প্রোথিত কার্যক্রমের ধারার বিপরীতে শুধুমাত্র যাত্রা পরিচালনা করা যার আয়ু ক্ষমস্থায়ী তার ফল প্রদানের ক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা সমীচীন নয়। একবার জনযাত্রা শেষ হয়ে গেলে পথের ধুলোর ওড়া বন্ধ হলে অতি ক্ষুদ্রতম প্রেরণা সমর্থকদের মধ্যে উজ্জীবিত করার জন্য অবশিষ্ট থাকে যা তাদের ভবিষ্যতে তৃণমূল স্তরে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে পর্যাপ্ত নয়। একই সঙ্গে এই যাত্রার যে বৃহত্তর প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা যদি থেকেও থাকে বিজেপির সঙ্ঘ মাধ্যমগুলির ক্রমিক সুসংহত পরিচালন ফল তাকে হালকা করে দেবে।

গুজরাট নির্বাচনের আগে বিজেপি সংগঠন ও সরকার বহুবিধ গঠনাত্মক ঘোষণা নিশ্চয় করবে বা করছে, একই সঙ্গে তারাও কিছু সাঙ্কেতিক রাজনীতিতে হাত লাগাবে। এই ধরনের যুগপৎ প্রক্রিয়ায় নির্বাচন পরিচালনার দক্ষতা ভারতবর্ষে নরেন্দ্র মোদীর মতো অতীতে বর্তমানে কেউই দেখাতে পারেনি। কংগ্রেসের বরঞ্চ খেয়াল রাখা উচিত নির্বাচন শুরু থেকে আগের এই ৫ মাস প্রচারমাধ্যম ও জনগণের কৌতূহল ক্রমশ বাড়তে বাড়তে নির্বাচনের কি একমুখী হয়ে যাবে।

আমি কখনই বলছি না যে সাঙ্কেতিক রাজনীতির জন্য বা দলীয় কার্যকর্তাদের ওপর কোনো প্রভাব ফেলে না। কিংবা দলীয় সংগঠনকে চাঙ্গা করে তুলতে বিশেষ করে একটি হত্যোদম কর্মীবাহিনীকে অনুপ্রাণিত করে নতুন রক্ত সঞ্চালনে এর কোনো ভূমিকা নেই। অবশ্যই

কংগ্রেসের তরফে এই উদ্যোগ, বিশেষ করে কংগ্রেসের হাতে যেখানে বিজেপির মতো একটি বিপুল ক্ষমতাশালী ও নিপুণ নির্বাচনী পরিচালকদের সঙ্গে তুল্যমূল্য পাল্লা দেওয়ার মতো আয়ুধের বিশেষ অভাব রয়েছে। কিন্তু শুধু মাত্র পথযাত্রাই নির্বাচনী সংগ্রামে প্রথম ও শেষ উপকরণ হতে পারে না। কংগ্রেসের তরফে অন্য সমঝদারিত্ব সবিশেষ প্রয়োজন। শুধু এইটুকু প্রচেষ্টা করেই নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকা বুদ্ধিমানের বা নির্বাচনী পারদর্শিতার কাজ হবে না।

এই সূত্রে উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেসের দুটি সাম্প্রতিক প্রচার অভিযান যেগুলির সাঙ্কেতিক ফল হিসেবে কতটা জনতার ওপর প্রভাব ফেলেছে যা যাচাই করলে নিরাশাজনক ফলই উঠে আসছে। এর মধ্যে একটি ছিল নারী ক্ষমতায়ন (লেড়কী হুঁ লড় সকতী হুঁ) এবং দ্বিতীয়টি স্বয়ং প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর উত্থান। এ দুটিই সম্পূর্ণ মুখ থুবড়ে পড়েছে। এই সূত্রে যাত্রা ইত্যাদির কোনো কমতি ছিল না। পদযাত্রা, ট্রাকযাত্রা মিছিল সবই ছিল। এর মূল কারণ মানুষের তাৎক্ষণিক পথ-কৌতূহল ছাড়া জমিনি স্তরে এই ভাবনাকে ছড়িয়ে দেওয়ার কোনো সংগঠনের অস্তিত্ব ছিল না।

সেই কারণে মনে হয় কংগ্রেস নেতাদের ও সমর্থকদের এই যাত্রার ওপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করার বা প্রত্যাশা করা ঠিক নয়। 'ভারত জোড়ো যাত্রা' যে ভারতের চলতি রাজনীতির গতিমুখ বদলে দেবে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ বলেছেন সেটি সঠিক নয়। হায়! মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং তাঁর প্রচার মাঝারি স্তরে শুরু করেছিলেন, কোনো উচ্চ কলরবে নয়। ধীর গতিতে সেই আন্দোলন দানা পাকিয়েছিল। তিনি বহু রাজ্য ও সেখানকার প্রত্যন্ত গ্রামে মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণে আন্দোলন ছড়িয়ে দিতে সফল হয়েছিলেন। তিনি গ্রামে গ্রামে ঢুকেছিলেন। উপরিউক্তগুলি ছাড়াও আরও কিছু সমস্যা রয়ে গেছে।

(১) যাত্রা পরিচালনা বাদে কংগ্রেস দলকে তাদের অভ্যন্তরীণ সভাপতি নির্বাচিত করার মতো সমস্যাসঙ্কুল কাজটি সমাধা করতে হবে। যে দুটি রাজ্যে তারা ক্ষমতায় আছে সেখানে ও অন্য সম্ভাবনাময় রাজ্যেও নানান সঙ্কট দেখা দিচ্ছে। সেখানেও নজর দেওয়া জরুরি।

(২) রাহুল গান্ধী নিজে সভাপতি নির্বাচনে অংশ নেবেন কিনা সেটা পরিষ্কার হতে কয়েক বছর লাগল। এখন খোলা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কী হয় তা নিয়ে পড়ছে চিন্তার ভাঁজ। অশোক গেহলট তুমুল ডামোডোল করেছেন।

(৩) তাহলে বিপুল খরচা সাপেক্ষ ভারত জোড়ো যাত্রা কেবলমাত্র কংগ্রেসের রাহুল গান্ধীর জনপ্রিয়তা পরীক্ষার একটি চরম নিদর্শন হয়েই থাকবে?

শেষে বলা যায় ভারতের সংসদীয় রাজনীতিতে একটি প্রাণবন্ত বিরোধী শক্তি দরকার যাদের জনসমর্থন আছে। অবশ্যই 'ভারত জোড়ো'র প্রচেষ্টা দীর্ঘদিন ম্রিয়মান থাকা কংগ্রেসকে অক্সিজেন নিশ্চয় দেওয়ার সম্ভাবনা রাখে। কিন্তু সেখান থেকে সাফল্য তুলে আনতে গেলে তাদের বিশ্বস্ত ও নির্লোভ নেতা তৈরি করার সঙ্গে তৃণমূল স্তরে জনসংযোগ পুনর্নির্মাণ জরুরি।

(লেখক অশোকা ইউনিভার্সিটির রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক)

সকলকে শুভ দীপাবলীর শুভেচ্ছা—

তারা মা পেপার কাটিং কোম্পানি

৯/৮এ, নলিন সরকার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৪

শোকসংবাদ

পরলোকে প্রবীণ স্বয়ংসেবক ড. সীতানাথ গোস্বামী

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ স্বয়ংসেবক অধ্যাপক ড. সীতানাথ গোস্বামী গত ১১ অক্টোবর ঢাকুরিয়ার নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৭ বছর। তিনি কিশোর বয়সেই নবদ্বীপ শাখার স্বয়ংসেবক হন। ১৯৪৮ সালে সঙ্ঘ থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবিতে সত্যাগ্রহ করেন এবং আলিপুর জেলে বন্দি ছিলেন। তাঁর নিজের কথায়— 'দলে ভারী হওয়ায় সে কী অপার আনন্দ!' বাঙ্গলার বিদ্বজ্জনদের মধ্যে তিনি এক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। স্বস্তিকা পত্রিকার ৫০ বর্ষ (১৯৯৮) উদ্‌যাপন সমিতির সভাপতি ছিলেন। বহু ছাত্র-ছাত্রী তাঁর তত্ত্বাবধানায় গবেষণা করে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি বেশ কয়েকটি গ্রন্থের রচয়িতা। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ও ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ-সহ বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে বেদান্ত ও ভারতীয় সংস্কৃতি বিষয়ে নিয়মিত বক্তব্য রাখতেন। আজীবন রাষ্ট্রহিতে ব্রতী এমন একজন স্বয়ংসেবকের মৃত্যুতে দেশ একজন সুসন্তানকে হারাল।

* * *

উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহার খণ্ডের জয়হাট মণ্ডল কার্যবাহ পলাশ দেবশর্মা গত ১৪ সেপ্টেম্বর পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল মাত্র ২৮ বছর। ওই অঞ্চলের বাঘাইপুর গ্রামের 'ঠাকুর রাধাবল্লভ জমি রক্ষা কমিটির একটি পুকুর স্থানীয় মুসলমানরা দখল নেওয়ার চেষ্টা করলে গ্রামবাসীদের সঙ্গে হাতাহাতি বেধে যায়। সেই সময় পলাশের মাথায় কেউ আঘাত করে। কিছুদিন চিকিৎসাধীন থাকার পর সে পরলোকগমন করে। তার মা, বাবা ও চারভাই বর্তমান।

* * *

মালদা জেলার গাজোল আটিলা শাখার স্বয়ংসেবক নিশিকান্ত সরকার গত ২৭ সেপ্টেম্বর সর্পদর্শনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৪ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ২ পুত্র ও অগণিত বন্ধু-বান্ধব রেখে গেছেন।

With Best Compliments
From :-

MAGNUM MACHINERY COMPANY

KOLKATA

With Best Compliments
From :-

Indegeneous Enterprises

KOLKATA

With Best Compliments
From :-

SHALIMAR INDUSTRIES LTD.

KOLKATA

With Best Compliments
From :-

Techno Manufacturing & Sales Corporation

KOLKATA

বাঙ্গলার মা, বাঙ্গালির কালী

শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী

'মা'— বড়ো আদরের ডাক। শ্রদ্ধার সম্বোধন। এই বঙ্গভূমির সবকিছুই মা আশ্রিত। ছোট্ট শিশু যেমন সামান্য ভয়ে চিৎকার করে ওঠে 'মা গো' বলে। তেমনি বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিও বিপদে পড়লে 'রক্ষা কর মা' বলে আকুতি জানায়। আমাদের রক্তে আছে মা'র প্রতি অগাধ আস্থা ও শ্রদ্ধাবোধ। তাইতো আমাদের পরিবারে মা ছাড়া বাকি মেয়েদের 'মা' যুক্ত নামে ডাকার পরম্পরা রয়েছে যেমন— জেঠিমা, কাকিমা, পিসিমা, মাসিমা, বউমা প্রভৃতি।

বাঙ্গলার মাটি শক্তি উপাসনার ক্ষেত্র। আর মা কালী আছেন সেই শ্রদ্ধার কেন্দ্রবিন্দুতে। শুধু সাধক, তপস্বী, সদাচারী, গৃহস্থরাই নয়, ঘোর অপরাধী ডাকাতরাও করত মা কালীর আরাধনা। এখানেই কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর, তারাপীঠ, নলহাটেশ্বরী, বর্গভীমা, রমনা (বাংলাদেশ), ঢাকেশ্বরী (বাংলাদেশ) কত শত শাক্ত সাধন ক্ষেত্র। বাঙ্গলার এমন কোনো ঘর নেই যেখানে মা কালীর ছবি বা বিগ্রহ নেই, এমন কোনো দেবালয় নেই যেখানে মা পূজিতা হন না, এমন কোনো ব্যক্তি নেই যিনি মায়ের উদ্দেশে সকাল-সন্ধ্যা প্রণাম জানান না। এই বঙ্গভূমি কালীময়।

আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতি জুড়েও মায়ের ছড়াছড়ি। বাঙ্গলার সাধক, মনীষী, দার্শনিক, লেখক, কবি, সাহিত্যিকেরা কথায় লেখায় মা কালীকে স্মরণ-মনন করেছেন কবিতায়, গানে, সাহিত্যে। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, বামাখ্যাপা, শ্রীরামকৃষ্ণ, দাশরথী রায়, নবীনচন্দ্র সেন, শ্রীধর কথকের মতো সাধক-রচনাকার; অরবিন্দ, বিবেকানন্দের মতো সমাজ সংস্কারক দার্শনিক; বঙ্কিম, রবীন্দ্র, দ্বিজেন্দ্র, নজরুলের মতো লেখক-সাহিত্যিক; নেতাজী, ক্ষুদিরাম, সূর্যসেনের মতো বীর বিপ্লবী— সকলের সাধনার কেন্দ্রে ছিলেন মা কালী।

পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝমাঝি কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম কালিকা পুরাণ অবলম্বনে রচনা করেছিলেন 'মহাকাব্য চণ্ডী'। সম্ভবত এটিই বাঙ্গলার শাক্ত ভাব জাগরণে 'শ্রী চণ্ডী'র প্রথম জনপ্রিয় বাংলা অনুবাদ। আর এক সাধক নবীনচন্দ্র সেন 'শ্রীমদ্‌ভগবৎ গীতা' ও 'শ্রী চণ্ডী'র ছন্দবদ্ধ পদ্যানুবাদ করেছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে এলেন আর এক সাধক রামপ্রসাদ সেন। কত কাহিনি যে ছড়িয়ে আছে তাঁর জীবনের পাতায় পাতায় তার ইয়ত্তা নেই। বিয়ের পরে যেদিন গুরু মাধবাচার্য তাঁকে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা দিলেন সেদিন থেকেই জীবনের গতি পরিবর্তিত হলো তাঁর। মা কালীকে পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় ডুবে গেলেন তিনি। পরিবারের অনটনে কলকাতায় এসে দুর্গাচরণ মিত্রের কাছে হিসাব রক্ষকের চাকুরি নিলেন বটে কিন্তু কাজে তাঁর মন ছিল না। হিসাবের খাতায় লিখতেন মা কালীর গান। দুর্গাচরণবাবু জানতে পেরে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় তাঁকে মাসিক বেতন অব্যাহত রেখে গাঁয়ে ফিরে মায়ের গান রচনা চালিয়ে যেতে অনুরোধ করলেন। জন্মস্থান হুগলীতে ফিরে তিনি পঞ্চবটীতে পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসে সাধনা করতেন ও শ্যামাসংগীত রচনা করে গাইতেন। নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর রচিত 'কালীকীর্তন' শুনে তাঁকে একশো একর করমুক্ত ভূমি দান করেন। কথিত আছে মা কালী নিত্য তার সঙ্গে লীলা করতেন। একদিন রামপ্রসাদ তার ছোট্ট কন্যাকে নিয়ে বেড়া বাঁধছিলেন। হঠাৎ মায়ের ডাকে মেয়ে ঘরে গেলে 'মা কালী' স্বয়ং তাঁর মেয়ের রূপ ধরে রামপ্রসাদকে সাহায্য করেছিলেন। আর একবার মা কালী এক সাধারণ মেয়ের রূপ ধরে তাঁর কাছে গান শুনতে এসেছিলেন। কিন্তু সে সময় তিনি গান শোনাতে রাজি ছিলেন না, রাতে স্বপ্নাদেশে মা অভিমান করে বলেন— আমি সুদূর কাশী থেকে এসে তোর কাছে গান শুনতেই চাইলাম, তুই ফিরিয়ে দিলি? দুঃখে রামপ্রসাদের মন কেঁদে উঠল। পরের দিনই বেরিয়ে পড়লেন বারাণসীর উদ্দেশে। কিন্তু মা আবার স্বপ্নাদেশ দিয়ে বললেন, 'আমি শুধু কাশীতে নয়, সর্বত্র আছি।' রামপ্রসাদ ফিরে এসে তাঁর বাড়ির মা কালীকেই প্রাণভরে গান শুনিয়েছিলেন। রামপ্রসাদের মৃত্যুও হয়েছিল মায়ের কোলে। এক কালীপূজার দিনে সারারাত ধরে মায়ের পূজা সেরে নামগান করতে করতে মাথায় ঘট নিয়ে ধীরে ধীরে গঙ্গায় নেমে গেলেন। আর উঠলেন না। মায়ের ছেলে যেন মায়ের কোলেই ঠাঁই নিল, আর আমাদের জন্য রেখে গেলেন— 'চাই না মাগো রাজা হতে', 'মনরে কৃষি কাজ জান না', 'দে মা আমায় তবিলদারি', 'বসন পর মা' প্রভৃতি অসংখ্য শ্যামাসংগীত— যা শতকের পর শতক বাঙ্গালিকে ভক্তি রসে জারিত করে রেখেছে।

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই যোগীর আবির্ভাব। তাঁর লেখা— 'শ্যামা মা কি আমার কালো', 'মা ত্বং হি তারা', 'সদানন্দময়ী কালী' প্রভৃতি গান আজও বাঙ্গালির মনে ভক্তির সুবাতাস ছড়ায়। কথিত, বর্ধমানের মহারাজা শুনেছিলেন কমলাকান্ত মা কালীর কৃপায় অসাধ্য সাধন করতে পারে। তাই তাঁকে একদিন মা কালীর লীলা প্রত্যক্ষ করতে ঘোর অমাবস্যায় পূর্ণিমার চাঁদ দেখাতে আবদার করলেন। কমলাকান্ত মায়ের কৃপায় মহারাজকে তা দেখাতে সমর্থ হয়েছিলেন। আর একবার মহারাজ জিজ্ঞাসা করেছিলেন— মন্দিরের এই কালী প্রতিমা মৃন্ময়ী না চিন্ময়ী? তাঁর যে প্রাণ আছে তার প্রমাণ কী? কমলাকান্ত একটি বেলকাঁটা এনে মাটির মূর্তির পায়ে আলতো করে ফুটিয়ে একটি বেলপাতা চেপে ধরলেন। ধীরে ধীরে রক্তে ভরে গেল পাতাটি। এই দৃশ্য দেখে ভয়ে ও ভক্তিতে মহারাজ কমলাকান্তের দু-পা জড়িয়ে ধরলেন। এমনই সাধক ছিলেন কমলাকান্ত।

এই বাঙ্গলার অবতার পুরুষ সাধক শ্রীরামকৃষ্ণদেব, যিনি দক্ষিণেশ্বরে রানি রাসমণির ভবতারিণী মন্দিরে পূজা করতেন— তিনি মা কালীর সঙ্গে দিব্যি কথা বলতেন। শুধু তাই নয়, চরম অবিশ্বাসী যুবক নরেন্দ্রনাথ যিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন— ঈশ্বর আছে তার প্রমাণ কী? রামকৃষ্ণ বলেছিলেন— আমি মায়ের সঙ্গে কথা বলি, চাইলে তোর সঙ্গেও কথা বলিয়ে দিতে পারি। সত্যি সত্যিই কথা বলতে পাঠিয়ে ছিলেন নরেনকে। মা-কে প্রত্যক্ষ করে পরিবর্তন হলো নরেনের— রূপান্তরিত হলেন বিবেকানন্দে। স্বামীজীও ছিলেন মাতৃভক্ত। গুরুপত্নী মা সারদাকে বলতেন, 'জ্যান্ত কালী।' শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে দুর্গা ও কালী পূজার প্রচলন স্বামীজীই করেছিলেন। যারা এদেশের সনাতন সংস্কৃতিকে অস্বীকার ও অবমাননা করেন তাদের উদ্দেশে তাঁর সাবধান বাণী— 'এ দেশে মা কালী পাঁঠা খাবে, বুড়ো শিব ষাঁড়ের পিঠে চড়ে ডমরু বাজাবে। পছন্দ হয় থাকো, নইলে কেটে পড়।' স্বামীজী মা কালীকে নিয়ে লিখেছিলেন এক অসামান্য ইংরেজি কবিতা 'কালী দ্য মাদার'। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তার অনুবাদ করে নাম দিয়েছিলেন 'মৃত্যুরূপা মাতা' নামে।

'তোর ভীম চরণ নিক্ষেপ প্রতিপদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে

কালী, তুই প্রলয় রূপিণী আয় মাগো আয় মোর পাশে

সাহসে যে দুঃখ-দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে

কাল নৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।'

স্বামীজী তাঁর স্বদেশ মন্ত্রে দেশমাতৃকা ও দেবী মহামায়াকে এক ও অভিন্ন বলে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, '...হে ভারত ভুলিও না— তোমার উপাস্য ঊমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর। ...ভুলিও না— তোমার সমাজ যে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র...'। এই দেশ, এই সমাজকে মহামায়া অর্থাৎ দেবী চণ্ডীর অংশমাত্র বলে আমাদের যিনি স্মরণ করিয়েছেন— তিনি স্বামী বিবেকানন্দ।

এক ঋষি, যিনি প্রথম আমাদের শিখিয়েছিলেন আধ্যাত্মিকতাই হলো জাতীয়তা, দেশসেবাই হলো ঈশ্বরপূজা, যিনি লিখেছিলেন জাতীয়তার বীজমন্ত্র 'বন্দেমাতরম্'--- তিনি ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। দেশ মানে— ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী— অসুর দলনী দশভুজা তাঁর আনন্দমঠ উপন্যাসে দেশমাতৃকা। ব্রহ্মচারী ভবানন্দ মহেন্দ্রকে নিয়ে গভীর বনে প্রবেশ করেছেন। এমন বন যেখানে দিনের বেলায়ও সূর্যরশ্মি প্রবেশ করে না। ভবানন্দ মহেন্দ্রকে নিয়ে সেখানে এক দেবালয়ে উপস্থিত। আলো আঁধারিতে মহেন্দ্র দেখেন বিবিধ অলংকারে ভূষিতা এক অপরূপা জগদ্ধাত্রী মূর্তি। মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন— কে উনি? ব্রহ্মচারী বললেন— মা। মহেন্দ্রর প্রশ্ন— কে মা? ব্রহ্মচারী বললেন— আমরা যার সন্তান। মহেন্দ্রর পুনরায় প্রশ্ন— ইনি কে? ব্রহ্মচারী বললেন— 'মা যা ছিলেন।' অর্থাৎ এক সময় আমাদের দেশ এমনই সর্ব ঐশ্বর্যে ভূষিতা ছিলেন। এরপর ব্রহ্মচারী মহেন্দ্রকে নিয়ে এক অন্ধকার সুড়ঙ্গে প্রবেশ করলেন। ক্ষীণ আলোয় মহেন্দ্র এক কালী মূর্তি দেখতে পেলেন। ব্রহ্মচারী বললেন— দেখ, মা যা হইয়াছেন। মহেন্দ্র সভয়ে বললেন— 'কালী'। ভবানন্দ বললেন— কালী, অন্ধকার সমাচ্ছন্ন কালিমাময়ী,— হৃতসর্বস্বা। দেশে সর্বত্রই শ্মশান, তাই মা কঙ্কালমালিনী। মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন— মার হাতে খাঁড়া কেন? ব্রহ্মচারী বললেন— আমরা মার সন্তান। মার হাতে অস্ত্র দিয়েছি। বল বন্দেমাতরম্। শেষে ভবানন্দ মহেন্দ্রকে নিয়ে দ্বিতীয় সুড়ঙ্গে প্রবেশ করলেন, সেখানে স্বর্ণালি সূর্যরশ্মিতে চারিধার উদ্ভাসিত। মহেন্দ্র দেখেন সেখানে এক পাথরের মন্দিরে সুবর্ণ নির্মিত দশভুজার প্রতিমা। সারা দেহে অলংকার, মুখে জ্যোতির্ময়ী হাসি। ভবানন্দ প্রণাম করে বললেন— এই মা যাহা হইবেন। দশভুজা দশ দিকে প্রসারিত পদতলে শত্রু বিমর্দিত, বরাভয় দানকারী— এস আমরা মাকে উভয়ে প্রণাম করি। মহেন্দ্র গদগদ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন— মা'র এ মূর্তি কবে দেখিতে পাইব? সত্যানন্দ বললেন— যবে মার সকল সন্তান মাকে মা বলিয়া ডাকিব, সেদিন উনি প্রসন্না হইবেন।' দেশবাসীকে দেশভক্তির এই পাঠ বোধকরি বঙ্কিমচন্দ্র ব্যতীত আর কেউ পড়াননি, সেখানে দুর্গা-কালী-ভারতজননী— সব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

এক সময় যার গানের কলিতে বাঙ্গলার যুব সমাজ দেশসেবার প্রেরণা লাভ করত, ব্রিটিশের গুলি খেয়ে, ফাঁসিতে ঝুলে আবার নতুন করে সকল দেশের রানি— জননী জন্মভূমির কোলে ফিরে আসার আকুতি জানাতো— তিনি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। 'ধাও ধাও সমর ক্ষেত্রে, গাও উচ্চে রণজয় গাথা/ রক্ষা করিতে পীড়িত ধর্মে, ডাকে এই ডাকে ভারতমাতা'— গানের উদ্‌ঘোষে নবতরুণের দল সেদিন সশস্ত্র বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এই গানে তিনিও দেশজননী ও মা কালীকে অভিন্ন রূপে কল্পনা করেছেন, বলেছেন— 'চল সমরে দিব জীবন ঢালি/ জয় মা ভারত জয় মা কালী।' —তাঁর দৃষ্টিতে ছিল দেশরক্ষা মানেই ধর্ম রক্ষা।

রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গলার আইডেন্টিটি--- আমাদের হৃদয়ের কবি। যাঁর কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধে এই দেশকে আমাদের সহজে জানা হয়ে যায়। তিনি তাঁর এক গানের ছন্দে এদেশের এক অপরূপ রূপের বর্ণনা দিয়েছেন।

'ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ

দুই নয়নে স্নেহের হাসি, ললাটনেত্র আগুন বরণ

ওগো মা, তোমার কী মুরতি আজি দেখিরে

তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।'

রবীন্দ্রনাথও এই গানে দেশমাতৃকাকে কল্পনা করেছেন মা কালীর সঙ্গে।

এক মহামানব, স্বদেশী আন্দোলনের চরমপন্থী যজ্ঞাগ্নি হতে যার জন্ম আর অন্তিমে এক মহাসাধকের রূপে যার জীবনের পরিসমাপ্তি— তিনি ঋষি অরবিন্দ ঘোষ। বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম্‌কে যিনি মন্ত্রে রূপান্তরিত করে সমগ্র দেশবাসীকে সেই মহামুক্তির মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন— তিনিই অরবিন্দ। ১৯০৪ সালের কোনো এক সময়ে তিনি রচনা করেছিলেন নিরানব্বইটি শ্লোক সংবলিত এক সংস্কৃত কবিতা— 'ভবানী ভারতী' যেখানে তিনি মা ভবানী

অর্থাৎ দেবী চণ্ডীকে তুলনা করেছেন দেশমাতৃকা 'ভারতীর' সঙ্গে। বলেছেন— যেমন করে মহিষাসুর মর্দিনী 'ভবানী' দুর্গা সব দেবতার পুঞ্জীভূত শক্তিকে একত্রিত করে এক মহাশক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন, ঠিক সেইরূপ এদেশের লক্ষ কোটি সন্তানের পরাক্রমশালী শক্তিতে সংগঠিত করে এদেশ রূপান্তরিত হয়েছেন দেবী ভারতীতে'। তাই এ দেশ 'ভবানী ভারতী'। এ কেবল ইট, কাঠ, পাথরের সমষ্টি নয়— মৃন্ময়ী আধারে চৈতন্যময় চিন্ময়ী সত্তা। যে সন্তান তার দেশমাতৃকার মঙ্গলের জন্য সর্বস্ব সমর্পণে প্রস্তুত হয়— মা কালী তার প্রতি সদয় হন। 'ভবানী ভারতী' তাই তার সন্তানের রক্ষাকারী কিন্তু এদেশের শত্রু ধ্বংসকারী। জননী জন্মভূমির এমন রূপের কল্পনা বোধ করি অরবিন্দ ছাড়া এই বাঙ্গলার আর কেউ করেনি।

আর এক বাঙ্গালি কবি ও গীতিকার— যার নাম না করলে বাঙ্গালির মাতৃসাধনার কথা অপূর্ণ থেকে যাবে তিনি হলেন নজরুল। 'বলরে জবা বল', 'মহাকালের কোলে এসে গৌরী হলো মহাকালী', 'জগৎ জুড়ে জাল ফেলেছিস মা' প্রভৃতি গানের ভাবে বাঙ্গালির পুত্রহৃদয় যেন যেন নিরন্তর তার 'কালী' মা-কে খুঁজে বেড়ায়। যৌবনে 'কারার ঐ লৌহ কপাট'-এর বিদ্রোহী কবি কখন যে কালী মায়ের স্নিগ্ধ কোলে ঠাঁই নিয়ে বাকি জীবন মাতৃসাধনায় কাটিয়ে দিলেন তা আজও বাঙ্গালির কাছে বিস্ময়ের। তিনি একদা মা কালীকে নিয়ে চরণা করেছিলেন এক অসাধারণ কবিতা— 'আনন্দময়ীর আগমনে'। তৎকালীন ধূমকেতু পত্রিকায় যা ছাপার কারণে রুষ্ট ইংরেজ এই পত্রিকা শুধু বাজেয়াপ্তই করেনি, নজরুলকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে নিক্ষেপ করেছিল—

'আর কতকাল থাকবি বেটি মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে, অত্যাচারী দস্যু চাঁড়াল
দেব শিশুদের মারছে চাবুক, বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসি
ভূ-ভারত আজ কসাইখানা, আসবি কখন সর্বনাশী?
মাদিগুলোর আদি দোষ ঐ অহিংসা বোল নাঁকি নাঁকি
খাঁড়ায় কেটে কর মা বিনাশ নপুংসকের প্রেমের ফাঁকি।...'

দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনে খড়্গধারিণী কালীকে তিনি আহ্বান করছেন। আবার আর এক স্তুতি গানে তিনি বলেছেন মৃত্যু মানে বিশ্বসংসার ছেড়ে যাওয়া নয়, বরং মায়ের কোলে পুনরায় ফিরে যাওয়া। তাঁর ভাষায় 'শ্মশানে জাগিছে শ্যামা মা/অন্তিমে সন্তানে নিতে কোলে/ জননী ব্রহ্মময়ী বসিয়া আছেন ঐ/চিতার আগুন ঢেকে স্নেহ আঁচলে।' —এই নজরুল মা কালীর কোলের ছেলে। গর্বিত বাঙ্গালির অন্যতম তন্ত্রসাধক কালীভক্ত সন্তান।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সর্বশ্রেষ্ঠ সেনানায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। ১৯২৫ সালে মান্দালয়ের কারাগারে বন্দি থাকাকালীন জেলের ভেতরে দুর্গা পূজা করার দাবি নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন তুমুল আন্দোলন। তাঁর জেদের কাছে হার মেনেছিল ব্রিটিশ প্রশাসন, জেলে হয়েছিল মায়ের পূজা। তিনিও দেবীর আরাধনাতে স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে— দেশভক্তি ও মাতৃভক্তিকে এক করে আমাদের লোকশিক্ষা দিয়ে গেছেন।

ফাঁসির মঞ্চে বাঙ্গলার প্রথম বলিদানী ক্ষুদিরাম বসু। তখন মাত্র ১৩ বছর বয়স তার। মাতৃহারা ক্ষুদিরাম একদিন দিদি অপরূপাকে না জানিয়ে স্কুল ছুটির পরে কাঁসাই নদীর তীরে জঙ্গলের ভেতরে বুড়ো শিবের মন্দিরে হত্যে দিয়ে পড়েছিল। নিজের আঙুল কেটে রক্ত আর বেলপাতা মা কালীর পায়ে অঞ্জলি দিয়ে বর চেয়েছিল— 'আমি যেন দেশের জন্য প্রাণ দিতে পারি।' মা কালী নিরাশ করেননি তার শিশুপুত্রকে। ফাঁসির মঞ্চেই তার জীবনদীপ নির্বাপিত হয়েছিল। ১৯০৮ সালের আগস্টের দিন ভোরে ১৭ বছরের ক্ষুদিরাম শিক্ষক কালীদাসবাবুর আনা মা ভবতারিণীর প্রসাদ খেয়ে হাসিমুখে এগিয়ে গিয়েছিল ফাঁসিকাঠের দিকে। মা যেন কোলে তুলে নিলেন তার সন্তানকে। দেশমায়ের সেবায় মা কালীর চরণে নিবেদিত হলো আরও এক সমর্পিত জীবন।

এরকম কত শত ঘটনা যে ছড়িয়ে আছে এই বাঙ্গলার কোণে কোণে তার হিসেব নেই। শুধু তাই নয়, বাঙ্গলার তৎকালীন বিপ্লবী দল অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর, বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার প্রভৃতি দলে যোগ দিতে নিতে হতো মন্ত্রগুপ্তির শপথ। কোথাও মা কালী, কোথাও-বা মা দুর্গার মূর্তিকে সামনে রেখে বুকের রক্ত, বেলপাতা আহুতি দিয়ে প্রতিজ্ঞা করতেন তারা।

এই দেশ তথা এই বাঙ্গলা যুগে যুগে মাতৃসাধনার দ্বারা ঈশ্বর লাভ এবং ঈশ্বররূপী স্বদেশের কাজে বীরব্রতর দ্বারা অমরত্ব প্রাপ্তির কাঙ্ক্ষিত পুণ্যভূমি। যার কেন্দ্রবিন্দুতে আছেন মা, শুধুই মা— জগৎজননী মা দুর্গা ও মা কালী। □

With Best Compliments from :-

Engineers Incorporated

Manufacturer of Machinery, Spares & Components Jute Carding Machines and Hard Waste Teaser Card

33, Janak Road (1st Floor)
Kolkata - 700 029
Phone : (033) 24660245/46
Website :
www.engineersincorporatedonline.com
E-mail :
sales@engineersincorporatedonline.com

Factory

Khurigachi Road, P.O.- Angus
Dist.- Hooghly
Phone : 26332620

ভারতে শক্তিসাধনার বিকাশ

কৃষ্ণচন্দ্র দে

তন্ত্র সাধনার শক্তি প্রাণময়ী। শক্তি অনাদি ও অনন্ত। শক্তির ধৃতি— শক্তির ক্রিয়া শিবের আশ্রয়ে। মহাকাল শিব সর্বশক্তিময়ী মহাকালীকে বুকে ধরে ধ্যানমগ্ন। সাংখ্যের দ্বৈত— পুরুষ ও প্রকৃতি। পুরুষ সাক্ষ্য-চৈতন্য, আর প্রকৃতি পুরুষের সৃজনশক্তি। শক্তির স্পন্দনেই হয় সৃষ্টি। শক্তির দুই প্রকাশ। এক, কেন্দ্রগ ও ক্রম:প্রকাশিত প্রকাশ, দুই, কেন্দ্রচ্যুত- সংকুচিত প্রকাশ। সংকোচ অপসারণে শিবের হয় স্পন্দনহীন স্থিতি। আর ক্রিয়াশীলা প্রকৃতির দুই প্রকাশ ঃ একটি বিন্দু (Frequency)— শ্বেতবিন্দু স্থির (শিব), অপরটি হলো রক্তবিন্দু যেটা ক্রিয়াশীল। তন্ত্র একেই বলেছে চেতনার বিকাশবিন্দু, কারণ শক্তি চিদ্-স্বরূপা— চেতনশক্তির সর্বশেষ স্বচ্ছতম প্রকাশ। অধ্যাপক হোয়াইট হেড শক্তিকে প্রাথমিক সৃজনশক্তি বলেছেন। শিবের নির্বিশেষে চেতনায় আমিত্ব বোধ নেই। শিবত্বের উপলব্ধিই পূর্ণ পুরুষার্থ। অর্থাৎ জ্ঞানের প্রকাশই হলো শক্তি। এই প্রকাশশক্তির মূলে থাকে ইচ্ছা। প্রাথমিক জ্ঞান নির্বিশেষ। এতেই সবিশেষ (determinate)-এর বীজ অন্তর্নিহিত আছে। শক্তির এই অমূর্ত প্রকাশকে অধ্যাপক হোয়াইট হেড বলেছেন সৃজন বেগ। সারদা তিলক রত্নে লিখিত আছে— বিন্দুই শিব, বীজ হলো শক্তি, আর 'নাদ' হলো এদের সম্বন্ধের প্রাথমিক স্ফুরণ। শিব ও শক্তির কোনো ভেদ নেই। ঊর্ধ্ব ও অধঃ এর মিলিত অবস্থা। একতত্ত্ব রূপ (a State of integral consciousness)। এই অবস্থার পরেই আসে জ্যোতির্জ্ঞান।

তান্ত্রিক সাধকদের সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা হয়। (১) দক্ষিণাচারী, (২) বামাচারী। শাক্ত মতে সাধনস্তরের সাতটি মিলের নির্দেশ আছে। আবার কারও মতে দুটি— (১) প্রবৃত্তি দায়িকা, (২) নিবৃত্তি দায়িকা। কেউ কেউ করেছেন মোট চারটি মিলে। বামাচারকে তারা পঞ্চম সাধনা বলেছেন। ষষ্ঠ সিদ্ধান্ত আচার, আর সপ্তম হলো কৌলাচার। শক্তি সাধনায় শ্রীশ্রী চণ্ডী হলেন মহালক্ষ্মী। আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা, তিনিই এক ও অদ্বিতীয়া। তিনি চিতিরূপা পরাপ্রকৃতি— বিষ্ণুমায়া, তিনি নারায়ণী, বৈষ্ণবীরূপা আদ্যাশক্তি। তিনি শ্রীকৃষ্ণের পরম মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী শ্রীমদ্ভাগবতের যোগমায়া উপাশ্রিতা। এই মহাশক্তি শিবাশ্রয়া। শিব নির্গুণ ব্রহ্ম, আর শক্তি হলেন সগুণ ব্রহ্ম।

শিবের মুখ হতে 'আগত' পার্বতী হৃদয়ে 'গত' এবং কেশবের 'মত' বলেই তন্ত্রের নাম আগম্ বলা হয়। প্রথম অক্ষরের সংযুক্তি দিয়ে। শক্তি-সম্ভূতির একরূপ মহাকালী। এই বিরাট স্বরূপের সামনে বিশ্ব ত্রস্ত। সংসার আসক্তি ভস্মীভূত এবং জীবের পশুত্ব বিলুপ্ত। স্মরণে ও ধ্যানে অন্তরে জাগে বিশ্বশক্তি। অমৃত ও অভয় তাঁর পরম আশীর্বাদ। মরণ যজ্ঞের ভিতর দিয়েই মৃত্যুরূপা কালী যেন অনন্ত জীবন।

মৃত্যুর ভিতর আছে যে অমৃতের বীজ, তাই উদ্‌ঘাটিত হয় ভক্ত মানসে। শক্তি সাধনায় ভক্ত সাধকের বিকাশ হয় ভক্তিভাব, ঈশ্বর ভাব ও শিব ভাব। রাধা কৃষ্ণও সেই একই ভাব, একই তত্ত্ব। যিনি কৃষ্ণ, তিনিই পরাপ্রকৃতি রাধা বা কালী। রাধা ও কৃষ্ণ একে অন্যের স্বরূপ, লীলারস আস্বাদনে ধরে দুইরূপ।

শ্রীশ্রী চণ্ডী তন্ত্রশাস্ত্রের সারস্বরূপ। মহামায়া ঘটন-অঘটন পটীয়সী ব্রহ্মশক্তি। এর দ্বারা ঈশ্বর সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সাধন করেন। তাঁর ইচ্ছাতেই জীবের বন্ধন-মুক্তি সাধিত হয়। সাধকের হিতার্থে দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী বিভিন্ন রূপ ধারণ করেন। দেবী ভাগবতে একেই ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবতী বলা হয়েছে। রুদ্র-যামলতন্ত্র, দেবী পুরাণ, কালিকা পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে মহামায়াকে পরব্রহ্ম, জগদীশ্বরী প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হয়েছে। শ্রীশ্রী চণ্ডীতে পাওয়া যায় মহামায়ার তামসী মূর্তি— মহাকালী, রাজসীমূর্তি মহালক্ষ্মী এবং সাত্ত্বিকা মূর্তি মহাসরস্বতী। ইনিই গীতার যোগমায়া ও বিষ্ণুমায়া।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে মহাকালীকে দশভুজা, মহালক্ষ্মীকে অষ্টাদশভুজা, এবং মহাসরস্বতীকে অষ্টভুজা রূপে বর্ণিত হয়েছে। মহামায়া বহু হয়েও এক— 'একৈ বাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।' শ্রীমহামায়া রুদ্রাণী। করেছেন মধুকৈটভ বধ, মহিষাসুর বধ, শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ। মায়ের শূল হলো আত্মজ্ঞান, তাই দিয়ে অস্মিতা অর্থাৎ অহংভাব যেমন নাশ করেছেন, তেমনি সব রিপুও ধ্বংস করেছেন। ধূম্রলোচন তাঁর

হুংকারেই ভস্মীভূত। অবিদ্যা বিদ্যার সামনে এমনিভাবেই বিনাশ পায়। দ্বৈত প্রতীতি হলো দৈত্য। মহামায়া সেই অসংখ্য দৈত্য নাশ করলেন। আটটি অসুরকুল দেবী নিধন করলেন, এরা হলো মানুষের অষ্টনাগপাশ। এদের নিধন করলেই জীবের মুক্তি হয়। আমিত্ব রূপ রক্তবীজ সাধনপথের বিঘ্ন। শূল অর্থাৎ আত্মজ্ঞান দিয়ে তাকে বিদ্ধ করলেন মহামায়া। তাই রক্তবীজের সব রক্ত দেবী পান করলেন। এই ভাবে মহামায়ার কৃপায় সব রিপু ধ্বংস হলেই সাধক আনন্দলোকে থাকেন। আনন্দলোকই জীবের নিত্য বৃন্দাবন।

আনুমানিক পাঁচ হাজার বছর পূর্বে দেবী পূজার নিদর্শন আমরা পেয়েছি মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পার প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে। বৈদিক যুগেও দেবী প্রভাবের উৎকর্ষ সর্বজনবিদিত। ব্রহ্ম বিদূষী বাক্ বলেছেন 'আমিই ব্রহ্মময়ী, আত্মা, দেবী ও বিশ্বেশ্বরী। ঋক্‌বেদের দেবীসূক্ত, রাত্রিসূক্ত এবং সামবেদের রাত্রিসূক্তে যে আদ্যাশক্তির সন্ধান পাওয়া গেছে, তাই-ই বেদান্তের প্রকৃতিতত্ত্ব ও তন্ত্রের প্রাণস্বরূপা। শক্তিপূজার প্রচলন খ্রি: ষষ্ঠ শতাব্দী থেকেই বাঙ্গলায় জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে (বাঙ্গলার শক্তিসাধনা--- ড. শশীভূষণ দাসগুপ্ত)। বাঙ্গলার এই শক্তি সাধনার একটা ক্রমবিকাশ আছে।

মাতৃসাধক রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ, শ্রীরামঠাকুর, শ্রীঅরবিন্দ, শ্রীসত্যদেব শ্রীনরেন্দ্র ব্রহ্মচারী প্রমুখ সাধক তাঁদের মা'-ডাকে মায়ের দেবী প্রতিমার মধ্যে এক চিন্ময়ী-রূপী জ্যোতির্লোক উপলব্ধি করেছেন।

'চিৎ সমুদ্রের মাঝে গো মা শক্তিরূপা মুক্তা ফলে'— শ্রীশ্রীচণ্ডীকে তাঁরা সর্বালংকারা সর্বপ্রহরণ-ধারিণী এবং অসুর বিনাশে দেবগণের রক্ষাকর্ত্রী বলেই শুধু ভাবেন না; ভাবেন তাঁকে মহাশক্তি যোগমায়া, চৈতন্যরূপিণী পরমাশ্রী। এই মহাশক্তি পরম সত্তাশ্রয়ী ক্রিয়াশীলা, সর্বনিয়ন্ত্রণ কর্ত্রী। শ্রীঠাকুর সত্যদেব এই প্রত্যখ্যানুভূতি পেয়েই রচনা করেছেন তাঁর অমর 'সাধন সমর' গ্রন্থ। দেবী কবচের মাধ্যমে সাধক সত্যদেব ঠাকুর পেয়েছেন দেবী চৈতন্য বা শক্তিচৈতন্য। দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় এই শক্তি চৈতন্য সাধন সমর রূপ পরিগ্রহ করে। মানুষ তার উপলব্ধিগত বোধে শক্তিলাভ করে জীবন সংগ্রামে (বাঙ্গলার শক্তি সাধনা— ড. শশীভূষণ দাসগুপ্ত)।

যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তি রূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈঃ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

শ্রীশ্রীচণ্ডী ও গায়ত্রী প্রণবস্বরূপা। শ্রীশ্রীচণ্ডী যেমনই লজ্জা তেমনই তুষ্টি। যেমনই ক্ষুধা-তৃষ্ণা তেমনই লক্ষ্মীরূপিণী। তিনি সর্বব্যাপিনী, সত্তাতে আত্মসমর্পিতা। পরমতত্ত্ব শিবের আশ্রয়ে মহাশক্তির এই নিত্যলীলা। ঊনবিংশ শতকে ও বিংশ শতকের প্রথমার্ধে শক্তি সাধনায় জারিত ছিল ভারতের মুক্তি সংগ্রাম। বিপ্লবীরা হাসতে হাসতে ফাঁসির মঞ্চে আত্মবলিদান দিতে পেরেছিলেন। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের প্রকৃতি খণ্ডে আছে, মহাশক্তি মূলা হতে পরমা প্রকৃতি বিশ্ব উৎপন্ন এবং তিনিই বিশ্বপ্রপঞ্চের সারভূতা পরাসত্তা। সেই দেবীকে কেউ কেউ শক্তি, উমা, লক্ষ্মী, ভারতী, গিরিজা, অম্বিকা, দুর্গা, ভদ্রকালী, চণ্ডী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী নামে অভিহিত করেছেন। এছাড়া শক্তির আরও দশটি রূপ দশমহাবিদ্যায় পাওয়া যায়, যথা— কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা। যে নামেই ডাকি না কেন প্রত্যেক দেবীই শক্তির আধার ও উৎস।

With Best Compliments from :

Durga Trading Co.

40, Strand Road, Fourth Floor (Room No.4)

Kolkata - 700 001

Phone : 2243-1722/ 2243 1447

Fax : 033-2243-3922

E-mail : aksadt_saboo@yahoo.co.in

Deals In:

Bamboo, Hardwood, Bamboo Chips & Other Raw Materials for paper mills

ভূত চতুর্দশী ও কিছু কথা

শ্রী অমিত লাল ঠাকুর

কার্তিকমাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথি 'ভূত চতুর্দশী' নামে পরিচিত। পশ্চিমবঙ্গে কালীপুজো ও ভ্রাতৃদ্বিতীয়া এসবের পাশাপাশি ধনতেরস (ত্রয়োদশী তিথি), ছট্‌পূজা, ভূত চতুর্দশীও পালনীয় দিন হিসেবে গণ্য হয়েছে।

দীপাবলির যে পাঁচদিন মুখ্যত উৎসব পালিত হয়, তার প্রথম দিনটি ধনতেরস, দ্বিতীয় দিন ভূত চতুর্দশী এবং এরপরের দিনই দীপাবলির মুখ্য উৎসবটি হয়ে থাকে। কথিত আছে, বিজয়া দশমীর দিন শ্রীরাম লঙ্কাবিজয় করার পর কার্তিকমাসের কৃষ্ণপক্ষের অমাবস্যা তিথিতে অযোধ্যায় ফিরে এসেছিলেন। তাই মহানন্দবশত অযোধ্যাবাসী তাদের প্রিয় রাজকুমারের ফিরে আসার আনন্দে এই দিনটিতে সারা অযোধ্যাতে প্রদীপ জ্বালিয়ে আলোকিত করেছিলেন। সেই থেকেই এই দিনে 'দীপাবলি উৎসব' শুরু। এই দিন পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র কালীপূজা হয়। কিন্তু দীপাবলির সঙ্গে কালীপূজার সম্পর্ক নেই। যেহেতু সেইদিনই অমাবস্যা থাকে, তাই অমাবস্যায় কালীপূজা হয়।

হিন্দুধর্মের প্রতিটি উৎসবেরই অনেক গূঢ়তর মাহাত্ম্য আছে। ভূত চতুর্দশী এই দিনটিও তার ব্যতিক্রম নয়। এই দিনের মাহাত্ম্যও অনেক বেশি। মূলত অশুভ শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে মনোবলকে দৃঢ় রেখে লড়াইপূর্বক শুভশক্তির জাগরণ তথা বিজয় ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা— এটি ভূত চতুর্দশীর মূল মাহাত্ম্য।

ভূত চতুর্দশী নামের দ্বারাই বোঝা যায়, ভূত, প্রেত, আত্মা, কালো জাদুবিদ্যা ইত্যাদির সঙ্গে দিনটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ভূত চতুর্দশীর রাতেই প্রত্যেক পরিবারের ১৪টি মৃত পূর্বপুরুষের আত্মা তাদের নিজেদের জীবিত উত্তরপুরুষ বংশধরদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। এছাড়াও বিভিন্ন আত্মা তাদের প্রিয় ব্যক্তিদেরও দেখতে আসেন, এটাও মান্যতা।

আসলে ভূত বলতে যা অতীত— এই অর্থও বোঝানো হয়। তাই আমাদের অতীত পুরুষদের অর্থাৎ আমাদের গত পূর্বপুরুষকেও সেদিন আমরা স্মরণ করি এবং তাদের উদ্দেশে সারা বাড়িতে ১৪টি মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে ঈশ্বর ও আমাদের পূর্বপুরুষদের স্মরণ করে থাকি। ভূত চতুর্দশীর রাতটিতে আসুরিক তথা ঋণাত্মক শক্তিসমূহ অধিক শক্তিশালী হয়। তাই আসুরিক শক্তি তথা ঋণাত্মক আত্মাদের দূরে রাখতেও সারা বাড়ি প্রদীপের আলোয় আলোকিত করা হয়। এছাড়া 'চতুর্দশী তিথি'টি হলো কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশতম দিন, তাই এই 'চতুর্দশপ্রদীপ প্রজ্বলন' তার তাৎপর্যও বহন করে। তেল বা ঘি দ্বারা মাটির প্রদীপ জ্বালালে তা মানব শরীরের পক্ষে উপকারী এবং তার দ্বারা গৃহে প্রবাহিত বায়ু পরিশোধিত হয়ে জীবাণুমুক্ত হয়। এর বৈজ্ঞানিক সত্যতাও রয়েছে। 'রূপচতুর্দশী' নামেও এই দিনটিকে জানা যায়। এই নামটি মৃত্যুর দেবতা যমরাজের

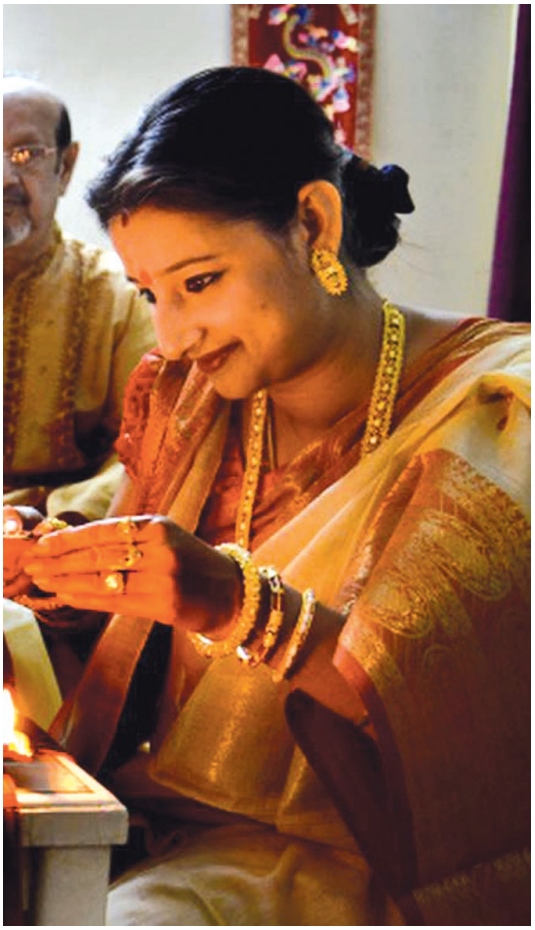

সঙ্গে সম্পর্কিত। এই দিন সন্ধ্যায় যমরাজের জন্যও বহু বাড়িতে বাড়ির দক্ষিণদিকে একটি প্রদীপ জ্বালানো হয়ে থাকে। বলা হয়, এই দিন যমরাজের উদ্দেশে প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখলে নরকের ভয় বা অকালমৃত্যুর ভয় কাটে।

পূর্বপুরুষদের স্মরণ করার পাশাপাশি ভূত চতুর্দশীতে ভেষজগুণযুক্ত ১৪টি শাকমিশ্রিত ব্যঞ্জন খাওয়া হয়ে থাকে, যা বিশেষ পুষ্টিযুক্ত। আসলে এটি শীতের প্রারম্ভে আমাদের শরীরের জন্য বিশেষ রোগ-প্রতিরোধকের কাজ করে থাকে। অনেকের মতে, ভূত চতুর্দশীর আগের দিন অর্থাৎ 'ধনতেরস' (ত্রয়োদশী তিথি) হলো ধন্বন্তরী আয়ুর্বেদজ্ঞের জন্মতিথি, যিনি কাশীর রাজা ছিলেন। তাঁর জন্মতিথি ত্রয়োদশী তিথির একেবারে শেষ লগ্নে, চতুর্দশীর শুরুতেই। তাই তাঁকে সম্মান জানিয়েই ও আয়ুর্বেদকে স্মরণ করেই ১৪টি শাকমিশ্রিত ব্যঞ্জন শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য খাওয়া হয়ে থাকে, শীতকালের প্রারম্ভের পরিবর্তিত আবহাওয়া থেকে সুস্থ থাকবার জন্যই। তাই এই ত্রয়োদশী দিনটিকে তাঁর নামানুসারেই 'ধন্বন্তরী তেরস' বা 'ধন্তেরস্' বলা হয়। এছাড়াও এই দিনের সঙ্গে ধন ক্রয় বা লাভেরও একটি সম্পর্ক আছে। যদিও অনেকের বিশ্বাস, এই দিনে সোনা-রুপা ইত্যাদি ক্রয় বা লাভ করলে অথবা মহালক্ষ্মী পুজো বা কুবেরের পূজো করলে গৃহস্থের ধন-ঐশ্বর্য ও শ্রীবৃদ্ধি হয়। তাই এই ত্রয়োদশী দিনটিকে 'ধন-ত্রয়োদশী', হিন্দিতে 'ধনতেরস্' নামেও অভিহিত করা হয়। দেশের বিবিধ প্রান্তের (বিশেষত উত্তরভারত) বহু মানুষ এই দিনে সোনা, রুপা ইত্যাদি ধনসম্পদ ক্রয় করে থাকেন এবং বিবিধ পূজাপাঠও করে থাকেন।

পুরাণ মতে, ভূত-চতুর্দশীর দিনই শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুরকে বধ করেন। তাই এই দিনটি 'নরক চতুর্দশী' নামেও খ্যাত। নরকাসুর ষোলো হাজার একশো কন্যাকে বন্দি করে রেখেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মা-কালীর সহায়তায় নরকাসুরকে বধ করে তাদের মুক্ত করেন। এই কন্যাদের পিতা বা স্বামীরা তাদের আর নিজের করে মেনে না নিলে, তারা লোকলজ্জায় আত্মহত্যা করতে উদ্যত হয়, তখন শ্রীকৃষ্ণ সকলকে পত্নীরূপে বরণ করে তাদের যোগ্য সম্মান দিয়েছিলেন।

আবার, মা চামুণ্ডা এই দিনেই প্রবল হওয়া আসুরিক শক্তি ও ঋণাত্মক প্রেত-আত্মাদের দূরীভূত করে থাকেন মহাকালীরূপে। এছাড়া, বছরের অন্যান্য কৃষ্ণচতুর্দশীর থেকে এই চতুর্দশী বেশি অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে। তাই একে 'কালীচতুর্দশী'-ও বলা হয়। এই নামটি মা-কালীর মহত্ত্ব বা কালোতম দিন— এই দুই অর্থেই হয়ে থাকতে পারে বলেই মনে হচ্ছে।

তাছাড়া, দীপাবলীর আগের দিনই যেহেতু অনেকে এই দিনেও প্রদীপ জ্বালায়, বাজি পোড়ায়, তাই দেশের কোনো কোনো জায়গায় (মূলত উত্তরভারতে) একে 'ছোটী দীপাবলী'-ও বলে।

গ্রামের দিকে এই দিনটিতে খুবই সাবধানে সকলে বাড়ির ভিতরেই থাকেন, মনে একটি মৃদু ভয় রেখো। কারণ মান্যতা আছে, এইদিন সমস্ত ঋণাত্মক শক্তি জাগরিত হয়। তান্ত্রিক সিদ্ধিও এই দিনেই অধিক ফলপ্রসূ হয়ে থাকে, এই দিন তাই দেবী কালীর পুজো করে তান্ত্রিক সিদ্ধিকে সফল করবার জন্য। প্রত্যন্ত গ্রামে বহু পূর্বে সিদ্ধিলাভের আশায় বলিপ্রদান করা হতো। নরবলির মধ্যে শিশুবলি উৎকৃষ্ট— এই অন্ধবিশ্বাস ছিল। তাই প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে শিশুদের এই দিন বাড়িতেই রাখা হতো, বেরোতে দেওয়া হতো না। এই ক্রূরতম অন্ধবিশ্বাস আপাতত প্রশাসন বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছে, প্রশাসনের চাপে এখন নরবলি বন্ধ হওয়ায় তা ছাগবলির মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। এর দ্বারা মনস্কামনা পূরণ হয় এটি সিদ্ধতান্ত্রিকদের মতো। কালোজাদুবিদ্যাও এই দিনেই অধিক প্রয়োগ করা হয়ে থাকে বলেও মত।

বহু শ্মশানে ও গৃহস্থ বাড়িতে এইদিন কালীপুজোও হয়ে থাকে। মা-কালীকে সুগন্ধজাতীয় দ্রব্য (যেমন— চন্দন, পুষ্প ইত্যাদি) দিয়ে পূজা দিলে আশীর্বাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সকল প্রকার বিঘ্নসমূহকেই বিনাশ বা দূরীভূত করে শুভ শক্তির প্রকাশের আশায় মাতৃশক্তির আরাধনা করা হয়। এই দিন দেবীর পূজার মাধ্যমে মনের আলস্য, ঈর্ষা, দ্বেষ, মোহ ইত্যাদি সকল প্রকার ঋণাত্মক ভাব ত্যাগ করে মনে ভক্তিভাব আনার চেষ্টা করা হয়ে থাকে।

(লেখক শিক্ষক, গৌড় মহাবিদ্যালয়, মালদা)

With Best Compliments
from :-

SHRUTI TIBREWAL

মহার্ঘভাতা বৃদ্ধি হয়নি বলে দুর্গাপুজোর আর্থিক সাহায্য বন্ধ হবে কেন?

এবারের দুর্গাপুজোয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি দরাজ হয়ে উঠলেন। ঘোষণা করেছেন পূজা কমিটিকে ৬০ হাজার টাকা এবং বিদ্যুৎ বিলে ছাড় দেবেন। বিষয়টি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বেশ চর্চা হচ্ছে। এমনকী ব্যাপারটা নিয়ে জল কোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছে। দুর্নীতিতে নাকানি চোবানি খাওয়া তৃণমূল সুপ্রিমো যথেষ্ট 'ব্ল্যাক পাবলিসিটি' জড়ো করতে পারছেন। এটা রাজনৈতিক লড়াইয়ে তাঁর একটা হাতিয়ার।

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা না দিয়ে কেন পুজোতে অনুদান দেবেন? এই নিয়ে চলছে সমাজের সর্বস্তরে জোর বিতর্ক। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, মহার্ঘ ভাতা দেওয়া না দেওয়ার সঙ্গে পুজো উদ্যোক্তাদের সাহায্য দেওয়া না দেওয়ার সম্পর্কটা কী? বলবেন আর্থিক দৈন্য সত্ত্বেও পুজো কমিটিতে আর্থিক সাহায্য দিয়ে লাভটা কী? রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা এতটা কম বেতন পান না যে তাদের সংসার চালাতে ভীষণভাবে কষ্ট হয়! সমাজে অনেক বেশি ব্যক্তি আছেন যারা করোনা মহামারী পরবর্তীকালে দুঃসহ জীবনযাপন করছেন। আর্থিক দৈন্য থাকা সত্ত্বেও যখন পুজো কমিটিকে আর্থিক অনুদান দেওয়া যাবে না তখন রাজ্যের শিক্ষিত ও শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে মহার্ঘ ভাতা দাবি করাটা কি যথাযথ? আইন আছে বলে মহার্ঘভাতার দাবিতে আন্দোলন বিক্ষোভ মিছিল করা 'নিজে বাঁচলে বাপের নাম' গোছের মানসিকতা নয় কি! পুজো কমিটিগুলোকে সাহায্য করে প্রচুর লাভ আছে। ইউনেস্কো দুর্গাপুজোকে বিশেষ হেরিটেজের মর্যাদা প্রদান করেছে। সেই মর্যাদাকে আরও মর্যাদা দান করার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন আছে বই কী। সরকারি বা বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া হেরিটেজ তকমা বাঁচিয়ে রাখা কঠিন। পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুজোয় যে পরিমাণে আর্থিক লেন-দেন হয় তাতে সমাজের সমস্ত ধরনের মানুষ আর্থিকভাবে উপকৃত হন। প্রান্তিক শ্রেণীর কথা তো বাদই দিলাম সমাজে ভিক্ষাজীবীরাও এই দুর্গাপুজোর জন্য হা-পিত্যেশ করে থাকে। ছোটো ছোটো ব্যবসায়ীরা বছরের এই একবার দুর্গাপুজোর কারণে সারা বছরের খোরাকি জোগাড় করে। কেউ কেউ হয়তো বলবেন দুর্গাপুজো মানে শব্দ দানবের অত্যাচার। কিন্তু তার মধ্যে দিয়েও সমাজের সিংহভাগ মানুষ বাঁচার আশা খুঁজে এই দুর্গোৎসবের মধ্য দিয়ে।

ভারতীয় সংবিধানে আইন করে মুসলমানদের ধর্ম পালনের জন্য বিশেষ করে বিদেশে হজ করতে যাওয়ার জন্য কোটি কোটি টাকা অনুদান দেওয়া হয়। তার আর্থিক পরিমাণটা ঠিক কত যদি হিসেব দেওয়া হয় চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যাবে। এদিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি ২৫৬ কোটি টাকা পুজো উদ্যোক্তাদের পিছনে খরচের ঘোষণা করে দেওয়ায় একদল ব্যক্তি রে রে করে উঠছেন। জনগণের ট্যাক্সের টাকা ধর্মীয় কারণে হজ করতে দেদার খরচ হবে, তাতে কোনো সমস্যা নেই! আর মমতা ব্যানার্জি হিন্দুদের দুর্গাপুজোয় অর্থ অনুদান দিলেই গেল গেল রব? মমতা ব্যানার্জি নিজেই তো প্রচুর টাকা খরচ করে 'হজ টাওয়ার' বানিয়েছেন, কোনো টুঁ শব্দ হয়েছে?

নেতা মন্ত্রীদের দুর্নীতির তদন্ত চলছে চলুক, মহার্ঘভাতা সরকার কবে দেবে তা নিয়ে আলোচনা চলুক, কিন্তু দেনা বা আর্থিক দুর্বলতার অজুহাতে একগোষ্ঠীর মানুষ বছরের পর বছর আইনকে কাজে লাগিয়ে আর্থিক সুযোগ পাবে, আর অন্য আরেক গোষ্ঠীর মানুষ আর্থিক সুযোগের ছিটে ফোঁটা পেলেও আইনের দ্বারস্থ হয়ে বন্ধ করতে হবে এটা চলতে পারে না।

—**বরুণ মণ্ডল,**
তিলডাঙ্গা রানাঘাট, নদীয়া।

চোর ধরো নবান্ন চলো

গত বিধানসভা ভোটের পর বিরোধী দলের সবচেয়ে বড়ো রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ মিছিল হলো চোর ধরো, নবান্ন চলো অভিযান। রাজ্য জুড়ে বর্তমান সরকারের শিক্ষা থেকে শুরু করে একশো দিনের কাজ, কয়লা, গোরু চুরি, সারদা, নারদার তদন্ত চলছে হাইকোর্ট ও সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশে। একে একে শাসক দলের নেতা, মন্ত্রী, কর্মীরা ইডি, সিবিআইয়ের হাতে ধরা পড়ছেন। এমনকী এইসব দুর্নীতির সঙ্গে আমলা, সরকারি আধিকারিক, পুলিশ, প্রশাসনও যুক্ত। তাই এই সংগঠিত দুর্নীতির মাধ্যমে গোটা রাজ্যের সাধারণ মানুষের টাকা লুঠ হয়েছে ও হচ্ছে। রাজ্যের প্রধান বিরোধী দলের জায়গায় পায়ের তলার মাটি শক্ত করতে এর থেকে ভালো ইস্যু আর কী হতে পারে। তাই ১৩ সেপ্টেম্বর চোরধরো, জেল ভরো আর নবান্ন চলো অভিযান প্রাসঙ্গিক ও যুক্তিযুক্ত। এই অভিযানের প্রচার রাজ্য জুড়েই একমাস ধরে হয়েছে। সাধারণ মানুষের কাছে একটা বার্তা পৌঁছানো গেছে পশ্চিমবঙ্গকে দুর্নীতি মুক্ত করতে হলে চোরদের জেলে ভরতে হবে। আর শিক্ষিত যোগ্য বেকারদের স্বচ্ছতার মাধ্যমে নিয়োগ করতে হবে।

১৩ সেপ্টেম্বর নবান্ন চলো অভিযানে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ চোখে পড়ার মতো ছিল। ঝিমিয়ে পড়া, বসে পড়া কর্মীরাও ওইদিন বর্তমান সরকারের লাগামছাড়া দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে নবান্ন চলো অভিযানে শামিল হয়েছিলেন। পুলিশ প্রশাসন সমবেত ভাবে অতি সক্রিয় হয়ে কর্মীদের উপর অমানবিক অত্যাচার করেছে কিন্তু বাঙ্গলার মানুষ বুঝে গেছেন এই দুর্নীতির সরকার আর নেই দরকার। তাই তারা আবার সংগঠিত হচ্ছেন এবং এই সরকারের বিভিন্ন দুর্নীতির বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করছেন। যিনি সাধারণ মানুষের মুখ্যমন্ত্রী তিনি বলছেন একজন গোরুচোর, কয়লা মাফিয়াকে বীরের

ফঃ ৩

With Best Compliments
from :-

SNEHASISH SEN

সম্মান দিতে। তার দলের নেতা, মন্ত্রীদের বলছেন চুরি করো, প্রমাণ রেখো না। এর থেকে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের দুর্ভাগ্য আর কী হতে পারে। তাই চোরদের মাথার উপর যার আশীর্বাদের হাত আছে, যিনি চোরদের উৎসাহ দিচ্ছেন— ওই চোদ্দ তলায় নবান্নে কম্পন ধরাতে এই অভিযান অতি প্রয়োজন ছিল।

তবে এটাও সত্যি যে, এই চোরদের ধরে বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে শাস্তি না দিলে পশ্চিমবঙ্গে কোনো দিন বিজেপি ক্ষমতায় আসবে না। বরং চোরেরা কুণাল ঘোষের মতো বলবেন পুরোটাই বিজেপি-র ষড়যন্ত্র, আমাদের নেতা, মন্ত্রী সম্পূর্ণ নির্দোষ ও সাধুপুরুষ। কোর্টের নির্দেশে তদন্ত চলছে। বিহারের লালুপ্রসাদের মতো এদেরও শাস্তি হোক। পশ্চিমবঙ্গ দুর্নীতিমুক্ত হোক। বাঙ্গলার সাধারণ মানুষের টাকা যারা লুঠ করে টাকার পাহাড় তৈরি করেছেন তাদের জেলের ভাত খাওয়ার ব্যবস্থা করা হোক। এই পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে চোর ডাকাত, মাফিয়াদের হাত থেকে রক্ষা করতে ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে এই নবান্ন অভিযানের কর্মসূচির প্রয়োজন আছে ও থাকবে।

—চিত্তরঞ্জন মান্না,
চন্দ্রকোণা রোড, গড়বেতা, পশ্চিম মেদিনীপুর।

মুম্বাই নামের উৎস প্রসঙ্গে

মুম্বাই নগরের সব থেকে প্রাচীন পূজিত দেবী হচ্ছেন মুম্বা দেবী। প্রায় ৬০০ বছর পুরনো। এই স্থানের পুরাতন অধিবাসী হচ্ছেন মৎস্যজীবী ও লবণ সংগ্রাহক যারা সাগরজল শুকিয়ে লবণ তৈরি করতেন। মুম্বাদেবীর প্রথম মন্দির ১৬৭৫ খ্রিস্টাব্দে বোরী বন্দরে নির্মিত হয়। পরে ১৭৩৯ থেকে ১৭৭০ সালে ধ্বংস হয়ে যায় মন্দিরটি। এর পরে নগরের ভুলেশ্বরে নতুন মন্দির নির্মিত হয়। বর্তমানে এখানেই দেবী পূজিত হন। ইতিহাস অনুযায়ী মুম্বা দেবী ছিলেন অম্বা দেবী। অম্বা হচ্ছেন দেবী পার্বতী। বাবা গণেশের মা। প্রচলিত মতানুসারে মহা-অম্বা থেকে মম্বা বা মুম্বা হয়েছে। এই মুম্বা অনুযায়ী নগরের নাম মুম্বাই।

বিষয়টি অন্যভাবেও লেখা যায় : অম্বা-ম্বা-মম্বা-মুম্বা-মুম্বই। লক্ষণীয়, 'অম্বা' শব্দ থেকে 'অ' ধ্বনি বাদ গেলে 'ম্বা' হয়। 'ম্বা' শব্দের 'ম' ধ্বনির উচ্চারণে জোর দেওয়ায় নতুন 'ম' ধ্বনি সৃষ্টি হয়। এর ফলে 'মম্বা' বা 'মুম্বা' হয়ে যায়। নগরের নাম হয় মুম্বাই। বিষয়টি ইংরেজিতে লেখা যায় : Amba-Mba-Mmba-Mumba-Mumbai।

—রাজকুমার জাজোদিয়া,
কালিয়াগঞ্জ, উ: দি:।

পাঠক্রমে নৈতিকতা চাইছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়!

এ যে দেখছি চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। পুরো পশ্চিমবঙ্গের সর্বনাশ করে এখন দেখছি উলটো খেলার ছক কষছেন মুখ্যমন্ত্রী। এতো দেখছি ভূতের মুখে রাম নাম। মনে পড়ছে অটলবিহারী বাজপেয়ী সেদিন দেশের প্রধানমন্ত্রী। সেই সময় এই কলকাতা শহরেই গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে এনসিআরটি-র এক আলোচনাসভায় 'ভ্যালু বেস অ্যাডুকেশন' ও 'শিক্ষায় মূল্যবোধের' কথা বলা হয়েছিল তখন মমতার কাছ থেকে বিন্দুমাত্র সমর্থন আসেনি। সেদিন বামপন্থী ও কংগ্রেস যখন মিলিতভাবে আক্রমণ করেছিল, মমতার নীরবতায় কি তাদের আন্দোলনের পালে হাওয়া লাগেনি? মমতা কখনই ন্যায়, সত্য ও বাজেটকে সমর্থন করে সামান্য একটি শব্দ ব্যয় করেননি। সেদিন এই বঙ্গে বামপন্থীরা বিজেপি/এনডিএ-র বিরুদ্ধে সভা সমাবেশ যখন করছিল তখন মমতা এখানে নিজের সংগঠন গুছিয়ে নিয়েছেন। আর বিজেপিকে নিজের আশ্রয়াধীন করে রাখতে চেয়েছিলেন। সেই কাজে মমতা ব্যানার্জি বিজেপির কয়েকজনকে কাজে লাগিয়ে ছিলেন। মনে পড়ছে কী?

আজ রাজনীতির নামে মমতা এই রাজ্যে অনেককেই চোর, ঠগ তৈরি করেছেন। এতদিন তৃণমূলের ওই ঠগ, চোর নেতারা টাকার পাহাড়ে বসে মমতার নামে জয়ধ্বনি দিলেও আজ তারা অন্য কথা বলছেন। এই রাজ্যের শহরের গ্রামের অলিতে গলিতে শুধু মমতার দলের চুরির আলোচনা চলছে। তারপর বিরোধী দলগুলো তো আছেই। সত্যিই আজ মমতা মহাবিড়ম্বনায় পড়েছেন। ঘরে-বাইরে সমালোচনা। এসে গেছে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী। নিশ্চয়ই আপনি ভীত বিচলিত।

বুঝতেই পারছি মমতা খুব চাপে আছেন। তার চিন্তা নরেন্দ্র মোদীকে নিয়ে। তিনি অটল বলে। শত ষড়যন্ত্রের মাঝেও তিনি সেদিন যেমন নিরুত্তাপ ছিলেন আজ দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েও দেশ-বিদেশের সম্মান পেয়েও তিনি কর্তব্যে অটল। কোনোদিন তিনি অন্যায়ের সঙ্গে সমঝোতা করেননি। সেটাই হলো মমতার মাথা ব্যথার কারণ। সবাই জানে মোদীজীকে ম্যানেজ করা অসম্ভব। তাই হয়তো?

বিধানসভা নির্বাচনের সামনে বিজেপির এক গায়ক এমপি ছড়া কেটে বলেছিল, 'যাদের মাথায় দিদির হাত, তারাই খাচ্ছে জেলের ভাত।' কী আশ্চর্য! সেই ছড়া আজ হুবহু মিলে যাচ্ছে। তাই মমতার আজ এই পরিবর্তন। আজ কত সহজেই মমতা বলতে পেরেছেন, 'আরএসএসের সবাই খারাপ নয়'। মমতার কাছ থেকে আরএসএস কোনো প্রশংসাপত্র চায়নি। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ দেশমাতৃকার সেবা করে অনেক ঝড়ঝাপটা কাটিয়ে শতবর্ষে পা দিতে চলেছে। কংগ্রেস তিন-তিনবার সঙ্ঘকে বেআইনি করেও দমিয়ে রাখতে পারেনি। শতবর্ষের দোরগোড়ায় এসেও আরএসএস তার সৃষ্টির সময় থেকে যে আদর্শ নিয়ে চলেছিল আজও তার একটুও পরিবর্তন করেনি। এটাই আরএসএস। তবে সত্যি যদি মমতা পাঠক্রমে নৈতিকতা চান তাহলে সর্বাগ্রে তিনি কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতিকে সমর্থন করুন।

—শ্যামল কুমার হাতি,
চাঁদমারি রোড, হাওড়া-৯।

With Best Compliments from :-

KEYA DEY

‘মা কালীর তবিলদারি’ নিয়েও তিনি হিন্দুদের মধ্যে ভেদজ্ঞান দূর করেছিলেন

কল্যাণ গৌতম ও সৌকালিন মাঝি

‘যে গাব গাছ হইতে তিনি ভাবের ঘোরে পদ্মফুল আনিয়া মায়ের পায়ে দিয়াছিলেন, তাহা তখনও তাঁহার জীর্ণ চালার পাশেই রহিয়াছে। তখনও প্রতি বৎসর সেইখানে কালীপূজা হইত।’ ১৮৯৬ সালে হালিশহরে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদ স্বামী অখণ্ডানন্দ মহামায়ার-দুলাল রামপ্রসাদের সাধনপীঠ দর্শন করে ‘স্মৃতি-কথা’ গ্রন্থে এই কথা সন্নিবিষ্ট করেছিলেন। তন্ত্রাচার্য ও যোগী, পরমপূজ্য কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের আশীর্বাদ সঙ্গে নিয়ে শক্তির উদ্বোধনে প্রবৃত্ত হলেন কুমারহট্ট-নিবাসী (বর্তমান হালিশহরের গঙ্গা তীরবর্তী জনপদ) জগন্মাতার ভাবোন্মাদ কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন।

হালিশহরের স্থান-মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে ‘কবিকঙ্কন চণ্ডী’ রচয়িতা মুকুন্দরাম চক্রবর্তী লিখছেন—

‘বামদিকে হালিশহর, দক্ষিণে ত্রিবেণী।
দু’কূলের যাত্রী রবে কিছুই না শুনি।।
লক্ষ লক্ষ লোক এক ঘাটে করে স্নান।
বাস হেম তৈল ধেনু কেহ করে দান।।’

চারিদিকে কলরবের মাঝেও একটি নিরুপদ্রব নির্জনতা, তারই মাঝে ঘন সন্নিবিষ্ট ক্ষুদ্র-বৃহৎ বৃক্ষে পরিপূর্ণ স্থান। মাঝে মাঝে এরণ্ডের বিস্তৃত জঙ্গল। অদূরেই পতিতপাবনী গঙ্গা। স্থানটিকে সাধনভজনের জন্য পছন্দ হলো। এই উদ্যানের মধ্যেই সর্প-ভেক-শশ-শৃগাল- নরমুণ্ডে পঞ্চমুণ্ডীর আসন তৈরি করে নিলেন রামপ্রসাদ। মাতৃমূর্তি নির্মাণ করে চললো পুজো, হোম, জপতপ। প্রাণ-প্রতিষ্ঠা মাত্রই সাধকের ডাকে মূর্তিমতী হলেন প্রাণময়ী। ভক্তের উদ্বোধনে উদ্বোধিতা স্বয়ং ক্ষেমঙ্করী। অভয়ার অভয়পদে নিজেকে সঁপে দিয়ে সংগীত সাধনায় আদ্যাশক্তির স্বরূপ মানুষের চৈতন্যে প্রোথিত করার কাজে নিয়োজিত হলেন। সাধনমার্গের সেই উচ্চতম সংগীত একশো বছর পরেও গেয়েছেন পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেব। কথামৃতে তার উল্লেখ আছে। পরমহংস যোগানন্দজীও এই সংগীতে ছিলেন আপ্লুত। ভগিনী নিবেদিতা রামপ্রসাদীকে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করেছিলেন।

রামপ্রসাদ কালী-কৃষ্ণে কোনো প্রভেদ দেখেননি। তাই অনায়াসে বলতে পারতেন, ‘শ্যামা হলি মা রাসবিহারী/নটবর বেশে বৃন্দাবনে।’ হিন্দু ধর্মের মধ্যে ভেদজ্ঞান তিনি দূর করেছিলেন। হয়তো এই ব্যাপারে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকেও মর্মার্থে প্রভাবিত করেছেন। সাধক রামপ্রসাদের মহাপ্রয়াণের প্রায় ষাট বছর বাদে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব। রামপ্রসাদ কবিত্বের স্ফূরণে দূর করতে চাইলেন শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, গাণপত্যদের বহিরঙ্গের প্রভেদ।

‘মন করে না দ্বেষা-দ্বেষী
যদি হবিরে বৈকুণ্ঠবাসী।।
আমি বেদাগম পুরাণে
করিলাম কত খোঁজ তালাশি।
ঐ যে কালী, শিব, রাম
সকল আমার এলোকেশী।’

তাই তো দেখা যায় তাঁর সংগীতে মা কালী শিবরূপে শিঙ্গা ধরেন, কৃষ্ণরূপে বাজান বাঁশি, রামরূপে ধরেন ধনু, কালরূপে হাতে অসি। তাঁর কাব্যে শ্মশানবাসিনী শ্যামা, অযোধ্যা নিবাসী রাম অথবা গোকুল নিবাসী কৃষ্ণ একাকার। শ্রীরামকৃষ্ণের ‘যত মত তত পথ’-এ হিন্দু ধর্মের মধ্যে একত্রীকরণের বীজ নিহিত আছে রামপ্রসাদের কাব্যে। অষ্টাদশ শতকের বাঙ্গলায় ভক্তি আন্দোলনের মাধ্যমে হিন্দুধর্মের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত হয় রামপ্রসাদের নেতৃত্বেই।

আমাদের উভয়কেই এক রামপ্রসাদী সংগীত প্রথমাবধি স্পর্শ করে আছে—

‘মন রে কৃষিকাজ জান না।
এমন মানব জনম রইল পতিত, আবাদ করলে ফলত সোনা।।
কালী নামে দেওরে বেড়া, ফসলে তছরুপ হবে না।
সে যে মুক্তকেশীর (মন রে আমার) শক্ত বেড়া তার কাছেতে যম ঘেঁষে না।।’

গানটি আমাদের দুঃখহারিণী মায়ের চরণকমলের অধিকার দিয়েছে, হয়তো কৃষিবিজ্ঞানের সমস্ত ছাত্র, গবেষক, অধ্যাপকদেরও দিয়েছে। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে গুরু-শিষ্য পরম্পরা কী হবে, হয়তো তাও ঠিক করে দিয়েছেন রামপ্রসাদ।

‘গুরু বপন করেছেন বীজ, ভক্তি করি তায় সেঁচ না।

তবে একা যদি না পারিস মন, রামপ্রসাদকে ডেকে নে না।।'

হ্যাঁ, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের খুবই কাছে এই পুণ্যশ্লোকের কালীমন্দির, আমাদের অনুক্ষণ পজিটিভ ভাইব্রেশনে অনুরণন করে। আমরা কি হালিশহরে গঙ্গার ধারে তাঁর ওই অমূল্য জীবনের স্রোত বইতে দেখেছি? না হলে অতি অবশ্যই যেতে হবে হালিশহর স্টেশন থেকে রিক্সায় চড়ে রামপ্রসাদ ভিটায়। সেখানে স্বয়ং ভক্তবৎসল ভগবতী সাড়া দিয়েছিলেন প্রগাঢ় ভক্তিবলের কাছে। আনুমানিক ১৭১৮ বা ১৭২৩ থেকে ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তাঁর ইহকাল যাপন। পাশেই 'চৈতন্য ডোবা', শ্রী চৈতন্য-স্মৃতিধন্য পুষ্করিণী, যেখানে স্বয়ং চৈতন্যদেব তাঁর পরমারাধ্য গুরুদেব বৈষ্ণব-সাধক ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থানে এসে পবিত্র মাটি নিজ বস্ত্রে বেঁধে নিয়ে গিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ভক্তেরা মৃত্তিকা নিতে নিতে হয়ে উঠলো একটি ডোবা। অর্থাৎ হালিশহর একাধারে বৈষ্ণবপীঠ, আর এক দিকে শাক্তপীঠ।

রামপ্রসাদের কবিত্বময় প্রকাশ তথা কাব্য-বীণার অঙ্কুরোদ্গমে প্রারম্ভিক অনুপ্রেরণায় ছিলেন কলকাতা নিবাসী জমিদার দুর্গাচরণ মিত্র। সেটা আনুমানিক অষ্টাদশ শতকের চল্লিশের দশক। পিতার মৃত্যুর পর সংসার প্রতিপালন করতে অভাবী রামপ্রসাদকে জমিদারির সেরেস্তায় মাসিক ত্রিশ টাকা মাইনের চাকরি নিতে হলো। গোমস্তা-কেরানিদের মধ্যে তাঁর কাজ। কাজের ফাঁকে হিসেবের খাতায় শূন্যস্থান ভরিয়ে ফেললেন নামগানের টেক্সট লিখে। একদিন তা ধরে ফেললেন উচ্চ আধিকারিক। তিনি খাতার 'হিজিবিজি' লেখার নিদর্শন সমেত জমিদারের কাছে নালিশ জানালেন। পাতায় পাতায় অমৃতোপম সংগীতের খসড়া পড়ে মুগ্ধ জমিদার! শাসন করতে তলব করতেই হলো তাঁকে। রামপ্রসাদ নির্বিকার। খাতায় তিনি লিখছেন মহামায়ার বিশ্ব জমিদারির কথা। ক্ষেমঙ্করীর খাসতালুকের প্রজা হয়ে তিনি তাঁরই খাজাঞ্চি হতে চান। জানিয়েও দেন ভাণ্ডার লুটতে তিনি কোষাধ্যক্ষ হতে চান না, পদের লোভ তার নেই, আছে মোক্ষপদের প্রার্থনা—

'আমায় দে মা তবিলদারি
আমি নিমকহারাম নই, শঙ্করী।

পদরত্ন ভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি

ভাঁড়ার জিম্মা যার কাছে মা, সে যে ভোলা ত্রিপুরারি

শিব আশুতোষ, স্বভাবদাতা, তবু জিম্মা রাখ তাঁরি।

আমি বিনা মাহিনার চাকর, শুধু চরণ ধূলার অধিকারী।'

রাশভারী জমিদারের অন্তকরণ কেঁদে উঠলো। জিজ্ঞেস করলেন, এ রচনা কার?

যখন নিশ্চিত হলেন; বুঝলেন মায়ার জগতে রামপ্রসাদের আকুতি কীসের জন্য! সে অর্থ নয়, কাম নয়, যশ নয়; বরং জগন্মাতার চরণতলের আকাঙ্ক্ষায়, লীলাময়ীর লীলাখেলায় সঙ্গী হতে তিনি পাগল। এবং তারই অভিব্যক্তি হিসেবের পাতায় পাতায় লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন তিনি। নিত্যের মাঝে অনিত্যের সন্ধানী এক ভক্ত সন্তান। বুঝলেন স্বার্থপর জগতে তাঁর স্থান বড্ডই বেমানান! জমিদার দুর্গাচরণ তাই চাকরি থেকে ছুটি দিয়ে গৃহবাসের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দিলেন রামপ্রসাদকে এবং কাব্যচর্চার অনুরোধ করলেন। আমৃত্যু তাঁর জন্য মাসিক বৃত্তির ত্রিশ টাকা বরাদ্দও করলেন।

রামপ্রসাদের কবি প্রতিভার পূর্ণ প্রকাশে বারি সিঞ্চন করেছিলেন কৃষ্ণনগরাধিপ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র। যাঁর সভা অলংকার করে বসতেন পঞ্চরত্ন। তাদের অন্যতম রত্ন ছিলেন রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, রসিক সম্রাট গোপাল ভাঁড় এবং বিশিষ্ট তান্ত্রিক তথা রামপ্রসাদের গুরু কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র এই নির্লোভ নিরহংকারী ব্যক্তিটিকে ব্রহ্মময়ীর পদতল থেকে টলাতে সক্ষম হলেন না। তিনি নিজের রচিত পঞ্চবটির তলায় পঞ্চমুণ্ডীর আসন ছাড়তে নারাজ। যিনি প্রলুব্ধ হন না, পার্থিব ধনসম্পদে তৃষিত নন, শঙ্করী ভিন্ন অন্যের অধীনতা স্বীকার করেন না, তাঁকে মায়ের চরণপদ্মের মকরন্দ থেকে বঞ্চিত করবেন কীভাবে! অতএব চেষ্টায় ক্ষান্তি দিলেন। কিন্তু রুষ্টও হলেন না। বুঝলেন—

'ওকে ধরিলে তো ধরা দেবে না—
ওকে দাও ছেড়ে, দাও ছেড়ে।'

মন যদি সে না দিল, তারই মন নিক কেড়ে। তিনি রামপ্রসাদকে ১০০ একর নিষ্কর ভূ-সম্পদ দান করলেন। আর কবিত্বকীর্তির পুরস্কার স্বরূপ দিলেন 'কবিরঞ্জন' উপাধি।

বাঙ্গলায় একটা সময় ছিল, যখন সমাজজীবন ছিল রামায়ণ ও রামনামে পরিপূর্ণ। বাঙ্গালি তাদের সন্তানের নামে 'রাম' কথাটি যোগ না করে পারতেন না। সন্তানকে ডাক দিয়ে পরমারাধ্যকেই তাঁরা ডাকতেন। 'রামপ্রসাদ' এমনই এক নাম। যদি রামপ্রসাদের বংশতালিকা দেখি, তবে দেখবো সেখানেও 'রাম' নামের ছড়াছড়ি। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে তিনি যে 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য রচনা করেন, সেখানে আত্মপরিচয় অংশে পূর্বপুরুষের নাম লিপিবদ্ধ রয়েছে—

'সেই বংশসম্ভূত ধীর সর্ব-গুণযুত,
ছিল কত শত মহাশয়
অনাচার দিনান্তর জন্মিলেন 'রামেশ্বর',
দেবীপুত্র সরল হৃদয়।।
তদঙ্গজ 'রামরাম' মহাকবি গুণধাম,
সদা যারে সদয়া অভয়া।।
'প্রসাদ' তনয় তার কহে পদে কালিকার
কৃপাময়ী ময়ি কুরু দয়া।।'

দেখা যায় রামেশ্বর সেনের পুত্র রামরাম সেন; তার পুত্র রামপ্রসাদ সেন, রামপ্রসাদের দুই পুত্রের নাম রামদুলাল ও রামমোহন। একইভাবে আমরা দেখতে পাই গদাধর শ্রীরামকৃষ্ণের বংশলতিকায় 'রাম'-যুক্ত বহু সন্তানের নাম রয়েছে। নরেন্দ্রনাথ স্বামী বিবেকানন্দের বংশলতিকাতেও তাই। বাঙ্গলার শ্রীরাম-উপাসনার ধারা যে কতটা গভীর ও বাস্তব, এ তারই প্রমাণ। ভগবান রাম কেবলই উত্তর ভারতের আরাধ্য নন।

তখন কৃষ্ণনগর নবাব সিরাজদৌল্লার অধীনে শাসিত অঞ্চল। কুমারহট্ট-হালিশহর কৃষ্ণনগরের শাসনাধীন। রামপ্রসাদের সরাসরি শাসক হচ্ছেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র। কর্মোপলক্ষ্যে তিনি যাচ্ছেন মুর্শিদাবাদে। সঙ্গে নিয়েছেন পুণ্যশ্লোক সাধককবি রামপ্রসাদকে। গঙ্গানদীর বক্ষে তাদের জলযান। সাধনমার্গের অপরূপ সংগীত কালীকীর্তন গাইছেন সাধক। সে এক প্রসাদী সুর, মধুময় সংগীত; বাউল-কীর্তন-শাস্ত্রীয় ধারা মিলেমিশে অপরূপ তার রাগ-রাগিণী। অমিয় সুধায়, অমল নদীপথ তাতে আপ্লুত। কল্লোলিত নদীর অনুক্ষণ ঢেউও তাঁকে সঙ্গত দিচ্ছে। মহারাজ আবিষ্ট হয়ে আছেন। এমন সময় নবাবি জলযানে জলবিহারে বেরিয়েছেন নবাব সিরাজদৌল্লা। তিনি শুনতে পেলেন নদীবক্ষের অমৃতোপম সংগীত-মাধুরী। তিনিও আবিষ্ট, পুলকিত, রোমাঞ্চিত। নৌকো ভিড়ালেন মহারাজের তরীর কাছে। তাদের দু'জনকেই তুলে নিলেন আপন তরীতে। নবাব কি বাংলা বুঝবেন! তিনি যে মুসলমান! তাঁর কাছে কী হিন্দুয়ানি পরিবেশন করা যায়। রামপ্রসাদ তাই হিন্দি খেয়াল গাইতে শুরু করলেন, গাইলেন ধ্রুপদ, গজল। নবাব তাতে আনন্দ পেলেন না।

বললেন, সেই গানটিই হোক, যা তাঁকে আবিষ্ট করেছে! রামপ্রসাদ এবার উদাত্তকণ্ঠে গাইলেন কালীগান, গাইছেন তো গাইছেন। নবাব ধন্য হচ্ছেন সনাতনী সংস্কৃতির পরত পেয়ে। □

With Best Compliments
from :

PAHARPUR COOLING TOWERS LTD.

PAHARPUR HOUSE

8/1/B, Diamond Harbour Road

Kolkata - 700 027, India

www.paharpur.com

CIN : U02005WB1949PLC018363

Ph. +91-33-4013 3000

Dir. +91-33-4013 3403

Fax : +91-33-4013 3499

vswarup@paharpur.com

ভারতীয় ধর্মসাধনার ইতিহাসে অবতারবরিষ্ঠ যুগপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ

নন্দলাল ভট্টাচার্য

আলো— শুধু আলো। প্রলয়পয়োধির মতোই উর্মিমুখর সে আলোর মহাসমুদ্র— যেন সহস্র সূর্যের মতোই হিরণ্যদ্যুতি। তা গ্রাস করছে একে একে সব কিছু। নেই মন্দির— নেই প্রতিমা— নেই কিছু। সেই সব নেইয়ের সাগরে ডুবতে ডুবতেই শ্রীরামকৃষ্ণ দেখেন— সামনে দাঁড়িয়ে মা। মা ভবতারিণী— শ্যামা জগজ্জননী— তাঁর কালী মা।

দেখেই প্রায় চৈতন্যহারা। তিনি প্রবল ভয় আর আন্তরিক আর্তি নিয়ে দু' হাত বাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন মায়ের কোলে— পরম আশ্রয়ে। স্ফুরিত হয় কণ্ঠ— মা-মা তুই এসেছিস। সত্যি— সত্যি মা।

কেটে যায় অনেকগুলো মুহূর্ত। ধীরে ধীরে স্ব-ভাবে আসেন রামকৃষ্ণ। তাকিয়ে দেখেন, শুয়ে আছেন মন্দিরের পাষাণ মেঝেতে। মা ভবতারিণীর পায়ের কাছে।

ভালো করে তাকান, সবই তো আছে সেই আগের মতোই। সবই তো স্বাভাবিক, দেখেন মা ভবতারিণী যেন তাঁরই দিকে তাকিয়ে হাসছেন মিটিমিটি। সে হাসির বাঙ্ময় রূপ— কী রে— কী ভেবেছিলি? এমন করে জীবন থেকে পালিয়ে মৃত্যুর তুহিন-শীতল ঘরের কড়া নাড়বি? ওরে— আমি যে মা। আমি তো তা হতে দিতে পারি না। এমনই নিঃশর্তভাবে আকুল হয়ে যারা ডাকে আমাকে তখনই ধরা দিই আমি। মা কি কখনও হারতে দেয় সন্তানকে— কখনও— কোনো কালে!

এবার দৃশ্যান্তর। কিছু আগে মায়ের আঁচলধরা কোলের ছেলেটির মতো বায়না। দেখা দে মা। মন্ময়ী নয় জীবন্ত ঘরের মা হয়ে আয় না তুই। কান্না— আর গান— রামপ্রসাদকে দেখা দিলি, আমাকে দেখা দিচ্ছিস না কেন?

শ্রাবণের বাদল ধারার মতোই অঝোর কান্না। তবুও মা পাষাণময়ীই, তখনই হাতে তুলে নিলেন খড়্গ— যখন দেখা দিবিই না, তখন রাখব না এ জীবন। ছিন্ন প্রাণ হয়ে পড়ে থাকব তোর পায়ের নীচে। দেখব কেমন লাগে তোর মা। কেমন করে সহ্য করিস সন্তান-বিয়োগ।

উদ্যত খড়্গ যখন নেমে আসে প্রায় গলায়, তখনই ধাঁধিয়ে গেল সব। আলোর তরঙ্গে ভাসলেন তিনি। আর তখনই মিলন হলো মা-আর ছেলের।

শ্রীরামকৃষ্ণের এই মাতৃসাধনা— অপত্য ভাবে মায়ের কোলে ঠাঁই পাওয়ার পরও প্রশ্ন, কেন তাঁর এই শাক্তভাব? তাঁরা তো রামভক্ত বৈষ্ণব। সাধারণ সাংসারিক রীতিতে তো এমন হওয়ার কথা নয়। তাহলে?

এই জিজ্ঞাসার মধ্যেই লুকিয়ে আছে ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনার পরম তত্ত্ব। এ তত্ত্বে তো সবকিছুই এক ব্রহ্মশক্তির লীলা। এ তত্ত্বে এক তিনিই— বহু, আবার বহু মিলে এক। এ গণিত বোঝা নয় অতি সহজ ব্যাপার।

জটিল, তবুও কষতে হয় আঁক। জীবনের ধর্ম সেটাই। আর তার থেকেই প্রশ্ন, রামকৃষ্ণরা তো রামায়েত বৈষ্ণব। রামচন্দ্র তাঁদের আরাধ্য। বাবা ক্ষুদিরাম এক সংকট মুহূর্তে কিছুটা অলৌকিক ভাবে পান রঘুবীর শিলা। রামচন্দ্রের সঙ্গে এই শিলার নিত্যপূজা হতো তাঁদের। বহু পুরুষ ধরে তাঁদের রাম-সাধনা। নামের সঙ্গেও যুক্ত 'রাম' নাম। পিতামহ মানিকরাম। বাবা ক্ষুদিরাম। দাদারা রামকুমার, রামেশ্বর। ভাইপো রামলাল, আর তিনি নিজে তো রামকৃষ্ণ।

তাহলে কৌলিক ধারা ছেড়ে কেন রামকৃষ্ণের এই শাক্তসাধনা? উত্তর বোধহয় রয়েছে তাঁদের জীবনচর্যায়। কামারপুকুরে রামচন্দ্র ও রঘুবীর শিলার নিত্যপূজার সঙ্গেই হতো রোজ শীতলা পূজাও। ঘরে ছিল শীতলার প্রতিষ্ঠিত ঘট। এরই সঙ্গে হতো রামেশ্বর বাণলিঙ্গ শিবেরও পূজা। বাণলিঙ্গটি এনেছিলেন ক্ষুদিরাম, রামেশ্বর থেকে।

অর্থাৎ কামারপুকুরের চাটুজ্জে পরিবারে ছিল এক ধরনের সমন্বয়ীভাব। সেটা রামকৃষ্ণের জন্মের আগে থেকেই। দাদা রামকুমার যজমানির সঙ্গেই করতেন আদ্যাশক্তির পূজা। তাই 'যতমত তত পথ' প্রবক্তা রামকৃষ্ণের শক্তিসাধনা ছিল কিছুটা পূর্বনির্ধারিত।

রামকৃষ্ণর কালীসাধনার প্রথম পর্বটি ছিল অপত্যভাবের। এরপর তন্ত্রসাধনা। পাশাপাশি বৈষ্ণব, শৈব ও অদ্বৈত সাধনার সঙ্গে ইসলাম ও খ্রিস্ট সাধনাও করেছেন তিনি। ধর্মসাধনার ইতিহাসে তাই তিনি অনন্য ব্যক্তিত্ব।

রামকৃষ্ণ ভক্তজনের কাছে অবতারপুরুষ। তিনি আজীবনই সাধক। তবুও ঐতিহাসিক দিক থেকে তাঁর সাধনকাল মোটামুটি ১২ বছরের। সেই বারো বছর আবার তিনটি পর্বে বিভক্ত। তাঁর সাধনক্ষেত্র হিমালয়ের কোলে নির্জন গুহা নয়। দক্ষিণেশ্বরই ছিল তাঁর সাধনপীঠ।

১৮৫৬ থেকে ১৮৫৯ পর্যন্ত চার বছর রামকৃষ্ণ কালী সাধনা করেছিলেন অপত্যভাবে। হয়েছিল মাতৃদর্শন। এই পর্বের পটভূমি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, দক্ষিণেশ্বরে রানি রাসমণির ভরতারিণী মন্দির প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ৩১ মে (১২৬২ বঙ্গাব্দের ১৮ জ্যৈষ্ঠ) বৃহস্পতিবার, স্নানযাত্রার দিন। সেই মন্দিরের প্রধান পুরোহিত হয়েছিলেন রামকৃষ্ণের দাদা রামকুমার।

শাস্ত্রবিদ রামকুমার জীবিকা নির্বাহের জন্য ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে কামারপুকুর থেকে কলকাতায় আসেন। টোল খোলেন ঝামাপুকুরে। এর বছর তিনেকের মাথায় তিনি রামকৃষ্ণকে কলকাতায় নিয়ে আসেন। তখন তাঁর বয়স ষোলো। বাংলা সালের হিসেবে ১২৫৯। দাদার টোলে দাদার কাছে পাঠ ও পূজা শেখেন তিনি ১২৬০ থেকে ১২৬১ সাল অর্থাৎ ১৮৫২ থেকে ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।

নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রথমে দক্ষিণেশ্বর

মন্দিরে বেশকারীপদে নিযুক্ত হন রামকৃষ্ণ। সম্ভবত তখনও পর্যন্ত তাঁর শাক্তমন্ত্রে দীক্ষা হয়নি। ১২৬২ সালেই কলকাতার বৈঠকখানা বাজার নিবাসী বিশিষ্ট শাস্ত্রজ্ঞ সাধক কেনারাম ভট্টাচার্যর কাছে দীক্ষিত হন রামকৃষ্ণ। কেনারাম ভট্টাচার্য সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য পাওয়া যায় না। শুধু জানা যায়, তিনি ছিলেন উচ্চমার্গের সাধক। সম্ভবত রানি রাসমণির বাড়ির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। সেই সূত্রেই আসতেন দক্ষিণেশ্বরে মাঝেমধ্যে। তাতেই আলাপ রামকুমার ও রামকৃষ্ণের সঙ্গে। দীক্ষা গ্রহণের কথা ওঠায় রামকৃষ্ণই কেনারাম ভট্টাচার্যের নাম বলেন এবং তাঁরই কাছে মন্ত্র নেন।

দীক্ষাগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে নাকি রামকৃষ্ণ ভাবাবেশে সমাধিস্থ হন। তাঁর এই অসাধারণ ভক্তি ও উচ্চভাব দেখে কেনারাম ভট্টাচার্য মুগ্ধ হয়ে তাঁকে ইষ্টলাভ সম্পর্কে প্রাণখুলে আশীর্বাদ করেন। এসব কথা জানা যায়, স্বামী সারদানন্দর 'শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ' গ্রন্থ থেকেই।

দৈবী বিধানে অথবা রামকুমারের শরীরস্বাস্থের কারণেই ১২৬২ সালেই রামকৃষ্ণ কালীমন্দিরের এবং রামকুমার বিষ্ণুমন্দিরের পূজক হন। সেই সঙ্গে শুরু হয় রামকৃষ্ণের রাগানুগা কালী পূজা। অপত্যভাবে গান গেয়ে, হৃদয়ের সব আকুতি দিয়ে শুরু হয় দেবীর পূজা উপাসনা। তারই মধ্য দিয়ে হয় তাঁর মাতৃদর্শন। তাঁর এই সাধনধারার কাল মোটামুটি ভাবে ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এই পর্বে শুধু অপত্যভাবে কালী সাধনা নয়, দাস্যভাবে মহাবীর হনুমানের উপাসনাতেও তিনি সিদ্ধ হন।

তাঁর সাধনার দ্বিতীয় পর্বের শুরু ১৮৬০ এবং সমাপ্তি মোটামুটি ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এই পর্ব তাঁর কেটেছে তন্ত্র সাধনায়। সে সাধনায় তাঁকে পরিচালিত করেন ব্রাহ্মণী ভৈরবী।

ইতিহাস কথন, ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ১৯ ফেব্রুয়ারি রানি রাসমণির মৃত্যু হয়। এর অল্প কিছুদিন পরেই দক্ষিণেশ্বরে আসেন ভৈরবী ব্রাহ্মণী শ্রীমতী যোগেশ্বরী। তাঁর পূর্বাপর ইতিহাস জানা না গেলেও তিনি যে একজন উচ্চমার্গের তন্ত্রসাধিকা ছিলেন তা মানেন সকলেই।

রামকৃষ্ণের মাতৃদর্শন হয়েছিল সন্তানভাবে রাগানুগা ভক্তির পথে। তবুও যুগের প্রয়োজনেই তাঁকে তন্ত্রমন্ত্রে শক্তি সাধনার পথে পরিচালিত করেন ব্রাহ্মণী ভৈরবীই। রামকৃষ্ণ যে অবতারপুরুষ একথা তিনিই প্রথম ঘোষণা করেন। তিনি যে অবতার তা প্রমাণের জন্য শাস্ত্রমতে রীতিমতো বিচারসভা বসিয়ে তৎকালীন বিশিষ্ট শাস্ত্রজ্ঞ এবং পণ্ডিতদের আহ্বান করেন। সে সভায় সমস্ত দিক বিচার করে সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণকে 'অবতার পুরুষ' বলে স্বীকৃতি দেন।

ব্রাহ্মণী যখন দক্ষিণেশ্বরে আসেন তখন তাঁর বয়স চল্লিশের কোঠায়। তিনি ছিলেন রীতিমতো সুন্দরী। ওই প্রৌঢ় বয়সেও সৌন্দর্যসুষমা তাঁর দেহ থেকে বিদায় নেয়নি।

তন্ত্র সাধনার ক্ষেত্রে বিশেষ করে বামাচারী পঞ্চ'ম'কারের সাধনা সম্পর্কে রামকৃষ্ণের ছিল চরম বিরক্তি এবং আপত্তিও। কিন্তু ব্রাহ্মণী নিজেই গুরুর আসন নিয়ে তাঁকে দিয়ে তন্ত্রসাধনার সব মার্গগুলিই পার করিয়ে দেন পরম দক্ষতায়। আর মনকে দৃঢ় ও নিশ্চল রেখে রামকৃষ্ণ অতিক্রম করেন সেই মার্গের চড়াই-উতরাই সব কিছু অতি সহজেই। ফলে তন্ত্রমতের সাধনাতেও তিনি পুরোপুরি সিদ্ধ হন।

রামকৃষ্ণের সাধনার তৃতীয় পর্বটির বিস্তৃতি ১৮৬৪-১৮৬৭টি পর্যন্ত চার বছর। এই পর্বে দক্ষিণেশ্বরে আসেন জটাধারী বাবা নামে এক রামায়েত সন্ন্যাসী। আরাধ্য তাঁর বালক রামলালা। বালগোপালের সেবার মতোই বাৎসল্যভাবে সেবা করতেন তিনি রামলালার। সত্যই যেন শিশু রামলালা তাঁর সঙ্গে খেলছে, দুষ্টুমি করছে, খাচ্ছে— নানা আবদার করছে, এমন ভাবেই মজে থাকতেন তিনি সর্বক্ষণ।

এই জটাধারী বাবা দক্ষিণেশ্বরে এসে মিলিত হলেন রামকৃষ্ণের সঙ্গে। সেটা ১২৭০ বা ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দের কথা। জটাধারী বাবা আসার পর রামকৃষ্ণের মধ্যেও বাৎসল্যভাব যেন প্রবল হয়ে উঠল। রামলালাও এবার জটাধারী বাবাকে ছেড়ে রামকৃষ্ণর সঙ্গেই বালসুলভ নানা খেলায় মেতে উঠলেন। আর তিনিও বৈষ্ণবীয় বাৎসল্য ধারায় তাঁর সাধনাতেই মত্ত হলেন।

এরই মধ্যে জটাধারী বাবার সামনে রামলালা একদিন আবির্ভূত হলেন নিজের দিব্যরূপে। তাঁকে দর্শন করে জটাধারী যখন মহানন্দে মগ্ন, সে সময় রামলালা জানান, এবার তিনি থাকবেন রামকৃষ্ণের কাছেই। সিদ্ধ সাধক জটাধারী বাবা বুঝলেন সব। আরাধ্যের নির্দেশ মেনেই তিনি জানালেন সব এবং চোখের জলে রামকৃষ্ণকে অর্পণ করলেন তাঁর রামলালাকে। তারপর বিদায় নিলেন সেখান থেকে।

বাৎসল্যভাবে রামলালার সাধনা করার সময়ই রামকৃষ্ণ মধুরভাবে প্রায় উন্মত্ত হয়ে কৃষ্ণ সাধনাও করেন। এ জগতে শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ আর সকলেই নারী বা গোপিনী, এই ভাবে বিভোর বৈষ্ণবীয় এই মধুর ভাবের সাধনাতেও সিদ্ধ হলেন তিনি।

বাৎসল্য ও মধুর ভাবে সাধনায় রামকৃষ্ণ যখন বিভোর সে সময়ই দক্ষিণেশ্বরে এলেন অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী তোতাপুরী। তিনি এসেছিলেন সম্ভবত ১৮৬৫ বা ১২৭১ সালের শেষদিকে। তাঁর এই আসাটাও যেন ছিল পূর্বনির্দিষ্ট। শাস্ত্রমতে সর্ব-সাধনাতে রামকৃষ্ণকে সিদ্ধ করতেই যেন তাঁর এই আসা। এর আগে তাঁর সাধন-গুরুরা কেউই তাঁকে সন্ন্যাস দেননি। কিন্তু দশনামী সম্প্রদায়ের সাধু তোতাপুরী তাঁকে শুধুই অদ্বৈত সাধন ধারাতেই দীক্ষিত করলেন না। সেইসঙ্গে তাঁকে সন্ন্যাসমন্ত্রেও দীক্ষিত করলেন। শিখা-উপবীত ত্যাগ করে বিরজা হোমের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রামকৃষ্ণকে দীক্ষা দেন তোতাপুরী। বলেন, এ জগৎ মায়া প্রপঞ্চময়। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র সত্য ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্মের সঙ্গে মিলনই জীবনের পরম লক্ষ্য। আর সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য হতে হয় ধ্যানমগ্ন। ধ্যানের মধ্য দিয়েই ঘটে নির্বিকল্প সমাধি। আর সেই সমাধিই এখন তোমার জীবনের ব্রত। মগ্ন হও ধ্যান সমাধিতে। সেই ধ্যানানন্দে মগ্ন হও তুমি সব কিছু ভুলে। গুরুর নির্দেশে ধ্যানে ধ্যেয় দর্শনে রামকৃষ্ণ গুরুকেও অতিক্রম করে পৌঁছে যান উপলব্ধির চরম সীমায়। আর তা দেখে বিস্মিত হন গুরু তোতাপুরীও।

তোতাপুরীর কাছে সন্ন্যাস নিলেও মায়ের বর্তমানে তিনি কোনো সন্ন্যাসচিহ্ন ধারণ করেননি। যাইহোক, অদ্বৈত সাধনাতেও সিদ্ধিলাভের পর রামকৃষ্ণ ইসলাম ও খ্রিস্টীয় ধারাতেও সাধনা করেন। আর সেসব সাধনার মধ্য দিয়েই ধর্মের প্রকৃত স্বরূপটি প্রতিভাত হয় তাঁর সামনে। তবে মাতৃসাধনাই যে ঈশ্বরলাভের প্রকৃষ্ট উপায় তা সকলের সামনে তুলে ধরতেই ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে বা বাংলা ১২৮০ সালের জ্যৈষ্ঠমাসে ফলহারিণী কালীপূজার রাতে ষোড়শী রূপে অর্চনা করেন সহধর্মিণী সারদামণিকে। জগতের সামনে তুলে ধরেন ধর্মসাধনার চরম নিদর্শন।

রামকৃষ্ণের পুরো জীবনটাই (১৮৩৬-১৮৮৬) ধর্মসাধনার পুত বারিতে নিষ্ণাত। সব সাধনার ধারা তাঁর মধ্যে মিলেমিশে গেলেও অপত্যভাবে মাতৃদর্শন ও মিলনই তাঁর কাছে শ্রেষ্ঠ অনুভূতি। সেই উপলব্ধি থেকেই তিনি জগৎকে শিখিয়েছেন শিব রূপে জীবের সেবা করতে। বলেছেন, সব ধর্মকেই সমান শ্রদ্ধা করতে। টাকা-মাটিকে সমান জ্ঞানের দিশা দেখিয়েছেন তিনিই। আর এসব কারণেই 'যত মত তত পথে'র উদ্গাতা রামকৃষ্ণ ভারতীয় ধর্মসাধনার ইতিহাসে 'অবতারবরিষ্ঠ' এক যুগপুরুষ। ■

সপ্তবর্ষীয়া কন্যারূপে পূজিতা হন মা করুণাময়ী

নিখিল চিত্রকর

একরাতে সদ্যমৃতা কন্যাকে স্বপ্নে দেখলেন নন্দদুলাল। মাত্র সাত বছর বয়েসি যে কন্যা ইহজগতের মায়া কাটিয়ে অনন্তলোকে যাত্রা করেছে। নন্দদুলালের আদরের ধন। যাকে হারিয়ে আজ সে উন্মাদপ্রায়। বিপর্যস্ত। সেই মৃতা কন্যা করুণা আজ এসেছে তাঁর স্বপ্নে। মুখে সেই অমলিন হাসি। সপ্রতিভ দৃষ্টি। নীরবতা ভেঙে করুণা বলছে, ''বাবা তুমি কেঁদো না, আমি তোমায় কোনও দিনই ছেড়ে যেতে পারব না। কাল ভোরে তুমি আদিগঙ্গার ঘাটে যেও। সেখানে পুরনো বটগাছের তলায় একটা কষ্টিপাথর দেখতে পাবে। সেই পাথর দিয়ে তোমার ইষ্টমূর্তি গড়ে প্রতিষ্ঠা করো। আমি ওই মূর্তির মধ্যেই চিরদিন চিন্ময়ী রূপে বিরাজ করব।'' এই ক'টি কথা বলার পরই নন্দদুলাল কন্যা করুণার পরিবর্তে তাঁর ইষ্টদেবী স্বয়ং মা দক্ষিণা কালিকার চিন্ময়ী রূপ দেখতে পেলেন।

এই অলৌকিক স্বপ্ন দেখে নন্দদুলাল অভিভূত হয়ে পড়লেন। দুচোখের পাতা এক করতে পারলেন না সারারাত। তাঁর আর তর সইল না। ভোর হতেই ছুটে গেলেন আদিগঙ্গার ঘাটে। সেখানে একটা প্রাচীন বটগাছের তলায় খুঁজে পেলেন স্বপ্নাদিষ্ট কষ্টিপাথর (কৃষ্ণশিলা)। যে প্রস্তরীভূত শিলার মধ্যে অনাদিকাল থেকে লুকিয়ে ছিল তাঁর ইষ্টদেবীর মহাপ্রাণ। মা,মা বলে পাগলপারা হয়ে সেই পবিত্র কৃষ্ণশিলা বুকে জড়িয়ে ধরলেন নন্দদুলাল। আদিগঙ্গার পাবক জলে তাঁর অভিষেক হলো। তা দিয়ে তৈরি হলো স্বপ্নাদিষ্ট চিন্ময়ী মূর্তি। সেখানেই দ্বাদশ শিবমন্দির-সহ একটি নবরত্ন মন্দির স্থাপন করলেন নন্দদুলাল। অধিষ্ঠিতা হলেন শ্রীশ্রী মা করুণাময়ী। এই মহানগরী কলকাতার দক্ষিণ প্রান্তে টালিগঞ্জ ট্রামডিপোর মোড় থেকে যে রাস্তা আদিগঙ্গা (স্থানীয়দের কাছে 'টালি নালা') পেরিয়ে সোজা হরিদেবপুর হয়ে ঠাকুরপুকুর চলে গেছে, সেই রাস্তারই ডানদিকে মা করুণাময়ী কালী মন্দির। দৈবস্বপ্নে মা করুণাময়ী নন্দদুলালকে বলেছিলেন, 'আমি কৃষ্ণশিলা মূর্তির মধ্যে চিরদিন চিন্ময়ী হয়ে বিরাজ করব।' মায়ের সেই আশীর্বাণী আজও চিরসত্য হয়ে প্রতিষ্ঠিত সাবর্ণ রায় চৌধুরীর কুলতিলক নন্দদুলাল রায় চৌধুরীর গড়ে তোলা এই করুণাময়ী কালী মন্দিরে।

সাবর্ণ রায় চৌধুরীর নাম কারও অজানা নয়। একান্ন পীঠের অন্যতম কালীঘাটের দক্ষিণা কালী মন্দির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে জড়িয়ে আছে সাবেক বঙ্গের এই জায়গিরদারের নাম। বাঙ্গলার বেশ কয়েকটি পরগণা ছিল তাঁর শাসনাধীন। কালীঘাট মন্দির নির্মাণ ছাড়াও বড়িশা, সরশুনা ও বেহালার বিভিন্ন স্থানে দ্বাদশ শিবমন্দির, রাধাকান্ত মন্দির, চণ্ডীমন্দির, অন্নপূর্ণা মন্দির, জগন্নাথ মন্দির, চণ্ডীমণ্ডপ ইত্যাদি নির্মিত হয় সাবর্ণদের উদ্যোগে। বাঙ্গলার অধ্যাত্মবাদের ইতিহাসে

টালিগঞ্জের হরিদেবপুরের মা করুণাময়ী কালী মন্দির।

সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের অবদান অনেকখানি। এই পরিবারে বহু উচ্চকোটির সাধকের জন্ম হয়েছিল। শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অন্যতম লীলাপার্ষদ স্বামী যোগানন্দ তথা যোগীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী ছিলেন এই সাবর্ণ রায় চৌধুরী বংশেরই সন্তান।

সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের কৃতী সন্তান হিসেবে সবচেয়ে আলোচিত নাম লক্ষ্মীকান্ত রায় চৌধুরী। তাঁর আমলে রায় চৌধুরীদের বিষয়আশয় ফুলেফেঁপে ওঠে। লক্ষ্মীকান্তর বিশাল জায়গির কেশবরাম রায় চৌধুরীর সময়ে শরিকদের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। কেশবরাম ছিলেন দক্ষ ভূস্বামী ও সুপ্রশাসক। কেশবরামের দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণদেব রায় চৌধুরীর একমাত্র সন্তান ছিলেন নন্দদুলাল। তিনি ছিলেন সাবর্ণ রায় চৌধুরীর ২৭তম বংশধর। তাঁর জন্ম হয় ১৭২২ সালে। নন্দদুলাল রায় চৌধুরীর পরপর তিনটি পুত্রসন্তান হয়। ইষ্টদেবী দক্ষিণা কালিকার কাছে একটি সুলক্ষ্মণা কন্যারত্ন লাভের প্রার্থনা করেছিলেন নন্দদুলাল। একসময় নন্দদুলালের ঘর আলো করে এল সেই ঈপ্সিত কন্যা। নাম রাখা হলো করুণাময়ী। নন্দদুলালের আদরিণী 'করুণা' পরিবারের স্নেহচ্ছায়ায় বড়ো হতে লাগল, এমন সময় হলো ছন্দোপতন। পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে পরলোকে যাত্রা করল করুণা। মাত্র সাত বছর বয়েসে!

নন্দদুলালের সেই ক্ষণজন্মা মেয়েই করুণাময়ী মা কালী রূপে বিরাজ করেন টালিগঞ্জের করুণাময়ী কালী মন্দিরে। ১৭৬০ সালে নন্দদুলাল রায় চৌধুরী নির্মিত নবরত্ন মন্দিরটি দেড়শো বছরের মধ্যে সংরক্ষণের অভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। সেখানেই গড়ে ওঠে একটি আটচালা মন্দির। পরে অসিত রায়চৌধুরী এই আটচালা মন্দিরের সংস্কার করে নতুন রূপ দেন। অবশেষে নবকলেবর প্রাপ্ত আজকের শ্রীশ্রী করুণাময়ী কালী মন্দিরের শুভ উদ্বোধন হয় ১৭ অক্টোবর, ১৯৮৫ সালে। বহু বিখ্যাত তন্ত্রসাধক এই মন্দিরের পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন। বর্তমানে করুণাময়ী মায়ের শিলাময় বিগ্রহ এই পঞ্চমুণ্ডির আসনের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী মা সপ্তম বর্ষীয়া।

প্রতিবছর কালীপুজোর দিন বহু ভক্তের সমাগম হয় এই মন্দিরে। অনুষ্ঠিত হয় কুমারীপূজা। সেদিন মা করুণাময়ীকে সাজানো হয় রাজবেশে। স্বর্ণালংকারে সজ্জিতা দেবী কালিকা এখানে রায় চৌধুরীদের ঘরের মেয়ে। তাই দেবীকে সাত বছরের কন্যা জ্ঞানেই পুজো করা হয়। কন্যা করুণা যা যা খেতে ভালোবাসত সে সবই নিবেদন করা হয় মা করুণাময়ীকে। এগারো রকমের মাছ, সাত রকমের ভাজা, সাত রকমের তরকারি, সাদা ভাত, পোলাও, লুচি, ছোলার ডাল, দই, মিষ্টি, পায়েস সহ নানারকমের ভোগ মাকে নিবেদন করা হয়।

এবছর করুণাময়ী মন্দিরের পুজো ২৬৩ বছরে পড়ল। মন্দিরের অছি পরিষদ সামাজিক কল্যাণ সাধনে প্রত্যয়ী। তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত। প্রতিবছর ১লা জানুয়ারি থেকে পাঁচদিন ব্যাপী কল্পতরু উৎসব পালন হয় এখানে। সাবর্ণ রায়চৌধুরীর ৩৫তম বংশধর অশোক রায়চৌধুরীর উদ্যোগে সেবামূলক কর্মসূচি নেওয়া হয়। উপস্থিত থাকেন রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীবৃন্দ। 'শিব জ্ঞানে জীব সেবা'-ঠাকুরের এই মহামন্ত্র শিরোধার্য করে সারা বছরই সেবাব্রতে নিয়োজিত থাকেন মন্দির কর্তৃপক্ষ।

দ্বীপান্বিতা কালীপুজোর দিন এখানে কুমারীপুজোর আয়োজন হয়। এবছরও সেই ঐতিহ্য বজায় রেখে করুণাময়ী কালী মন্দিরে পুজোর দিন দেবীরূপী করুণাকে স্মরণ করে কুমারীপুজো অনুষ্ঠিত হবে। পুষ্পে পুষ্পে ভরে উঠবে সালংকারা দেবীর গর্ভগৃহ। ধূপ, কর্পূর, ধুনোর সুগন্ধে সুরভিত হবে চারপাশ। প্রদীপের আলোয়, শঙ্খধ্বনী, ঢাক, কাঁসর, উলুধ্বনিতে মুখরিত হবে পূজাপ্রাঙ্গণ। ঠাকুরমশাইয়ের মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে হবে মায়ের আবাহন—

.....সুবর্ণালঙ্কৃততনুঃ সাবর্ণিকুলপূজিতা।
ভবার্ণবতারিত্রী যা নমস্তে করুণাময়ী।।
সর্পাভরণবামার্ধ দর্পাদিদোষনাশিনী।
সর্ব্বপাপহরা সাধ্বী নমস্তে করুণাময়ী।।

The Forest Friendly Company
Duroply Industries Limited
BLOCK BOARD · PLYWOOD · VENEERS · DOORS

Toll Free: 1800-345-3876 (DURO) | **Website:** www.duroply.in
E-Mail: corp@duroply.com | **Find us on:**

Disclaimer: The actual product may vary from the product shown as veneers are natural products and designs are unique and naturally evolved.
EURIGATO DYED CRYSTAL GREY

মা কালীকে কেন কলকাত্তাওয়ালি বলা হয়

বরুণ দাশ

বাঙ্গলার বাইরে মা কালীকে কলকাত্তাওয়ালি বলেই মনে করা হয়। অর্থাৎ মা কালীর আবাস কলকাতায়, এমনটাই লোকবিশ্বাস। বলা বাহুল্য, কলকাতার কালীঘাটের কালী এবং দক্ষিণেশ্বরের মা কালী জগদ্‌বিখ্যাত। দক্ষিণেশ্বরের মাতৃমূর্তির জন্মবৃত্তান্ত, অলৌকিকত্ব এবং লোকপ্রসিদ্ধির ইতিহাস আমরা কম-বেশি সকলেই জানি। কিন্তু কালীঘাটের মাতৃমূর্তির জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে আমরা ক্রমশ বিস্মৃতির পথে। সুতরাং কালীঘাটের মাতৃমূর্তির ইতিহাসের সন্ধান করাই আমার এই লেখার প্রধান বিষয়।

কথিত, ব্রহ্মানন্দ গিরি নামে এক যোগী ছিলেন। তিনি ব্রহ্মময়ী মায়ের সাক্ষাৎলাভের আশায় ওড়িশার নীলগিরি পর্বতের এক শীলাস্তম্ভে যোগাসনে বসে শুরু করেছিলেন কঠোর সাধনা। কিন্তু বহুকাল তপস্যা ও সাধনার পরেও ফললাভ না হওয়ায় তিনি আত্মহত্যায় উদ্যত হন এবং মা ব্রহ্মময়ী তখন ভয়ংকরী, করালবদনা মূর্তিতে আবির্ভূতা হন তার সামনে। শঙ্কিত যোগী মায়ের ওই ভয়ংকরী রূপ দেখে নিরুপায় ও সন্ত্রস্ত হয়ে তাঁকে ওই ভয়ংকরী রূপ সংবরণ করতে অনুনয় করলে, মা তখন সন্তানকে আশ্বস্ত করে দশমবর্ষীয়া বালিকা রূপে তাঁকে বলেন, 'তোমার তপস্যায় আমি সন্তুষ্ট, বর প্রার্থনা করো।'

ব্রহ্মানন্দ যোগী উত্তরে বললেন, 'কী আর বর চাইব, তবুও চাইতেই যখন বললে, বলি, যতদিন জীবিত থাকবো, ততদিন তোমাকে ডাকলেই যেন যে শিলাস্তম্ভের উপর এখন দেখা দিচ্ছো, ওই শিলায় তোমায় দেখতে পাই।' দেবী ব্রহ্মানন্দের ওই প্রার্থনায় তথাস্তু বলে ওই শিলাভ্যন্তরে অন্তর্হিতা হন।

ওই ঘটনার অনেকদিন পরে, দশনামী সম্প্রদায়ের আত্মারাম ব্রহ্মচারী মা ব্রহ্মময়ীর আশীর্বাদ লাভের জন্য তদানীন্তন গোবিন্দপুরের কালীহ্রদের কাছে কঠোর তপস্যায় অবতীর্ণ হন এবং আত্মারামের নির্বিকল্প তপস্যায় প্রীত হয়ে দেবী তাঁকে দর্শন দিয়ে বলেন, 'আমি বহুকাল ওড়িশার জনমানবহীন নীলগিরি পর্বতের এক শীলাস্তম্ভে আবদ্ধ আছি।

নীলগিরি পর্বতের ওই স্থান শীঘ্রই সমুদ্রে বিলীন হবে, তাই আমাকে পাবার জন্য ওই শিলাস্তম্ভটি এখানে এনে প্রতিষ্ঠা করো।'

আত্মারাম ব্রহ্মচারী এরপর বহুপথ অতিক্রম করে পুরীর নীলগিরি পর্বতে ব্রহ্মানন্দ গিরির সঙ্গে দেখা করে সমস্ত বিষয় বিবৃত করলে, তিনি যোগবলে অবগত হন যে, আত্মারাম ব্রহ্মচারীর সমস্ত কথাই সত্য। ব্রহ্মানন্দ গিরি তখন মা-কে ডেকে, তাঁকে জাগ্রত করে জানতে চান, কীভাবে এই শিলাস্তম্ভ গোবিন্দপুরের কালীহ্রদের কাছে নিয়ে যাওয়া যাবে? দেবী বললেন, 'ওই শিলাস্তম্ভের উপর তোমরা বসে গোবিন্দপুরের ওই স্থান স্মরণ করতে শুরু করলে ওই পাথর তোমাদের নিয়ে ভাসমান হয়ে ওখানে পৌঁছে যাবে। তবে কখনোই চোখ খোলা রাখা যাবে না, চোখ বুজে থাকতে হবে।'

তারপর শুভমুহূর্ত দেখে ব্রহ্মময়ীর নির্দেশে যে শীলাস্তম্ভে দেবী অন্তর্হিতা ছিলেন, সেই শিলাখণ্ডের উপর ওরা বসে পড়েন এবং চোখ বুজে তদানীন্তন গোবিন্দপুর, বর্তমানে কলকাতার কালীহ্রদের কথা চিন্তা করতে থাকলে ওই প্রস্তরখণ্ড ভাসমান হয়ে কলকাতার কালীহ্রদের কাছে এসে নিশ্চল হয়। তরপর ওই প্রস্তরখণ্ডে দেবীমূর্তি খোদিত করে, চৈতন্যময় শিলাকে কালিকা মাতৃ রূপে প্রতিষ্ঠা করা হয়। ওই শিলাখণ্ডটি যখন কলকাতায় এসে পৌঁছেছিল, তখন দৈর্ঘ্য ছিল ১২ হাত এবং প্রস্থ দু' হাত। ওই শীলাখণ্ডটি যে ওড়িশা থেকে এসেছিল, তার প্রমাণ মেলে, কালিকা মায়ের চোখে— মায়ের চোখ দুটি যথেষ্ট বড়ো, পুরীর জগন্নাথদেবের মতো। খোদাই করার সময় দেবীর যে চোখ নির্মিত হয়, তাতে ওড়িশার মূর্তি নির্মাণশৈলী প্রতিষ্ঠিত। খোদাই করবার পর কালী মা-কে কমলযোনী ব্রহ্মার কল্পিত বেদির উপর স্থাপন করে ভজন পূজন শুরু করা হয়।

ইতিপূর্বে দক্ষযজ্ঞের সময় সতীর দক্ষিণ পায়ের চারটি আঙুল খণ্ডিত হয়ে ওই দেবস্থানে পতিত হওয়ায় জায়গাটি মহাপীঠস্থানে পরিণত হয়েছিল। পরে নীলগিরি থেকে আগত কালী মা ওখানে প্রতিষ্ঠিত হলে ওই ক্ষেত্রের গুরুত্ব ও জনপ্রিয়তা বেড়ে যায়। সারা পৃথিবী থেকেই মানুষ এখানে এসে কালীমাকে পূজা দিয়ে পুণ্য লাভ করেন।

এর অনেক পরে, কলকাতার সাবর্ণ রায়চৌধুরী ও শ্যামা রায়রা কালীঘাটের কালী মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ শুরু করেন এবং শ্রীবৃদ্ধি ঘটান। দিনে দিনে সারা ভারত ও বহির্বিশ্বে এই মন্দিরের ও বিগ্রহের প্রসিদ্ধি ও মহিমা ছড়িয়ে পড়ে।

বর্তমানে এই মন্দিরের পারিপার্শ্বিক পুনর্গঠন করে আন্তর্জাতিক চেহারা দেওয়া হচ্ছে। স্কাইওয়াক এবং পুজোর ডালা বিক্রির জন্য নতুন ভাবে দোকানঘর গড়ে দেওয়া হচ্ছে ও মন্দির সংলগ্ন এলকাকে উন্নত করা হচ্ছে। বাবা লোকনাথ হিমালয়ে সাধনার জন্য রওনা দেবার আগে ভগবান গাঙ্গুলীর তত্ত্বাবধানে কালীক্ষেত্রে সাধনার বিবিধ প্রকৌশল আত্মস্থ করেছিলেন। সুতরাং কালীঘাটের সাধন ভজনের স্থানগুলিকেও উন্নত করা দরকার।

With Best Compliments from :-

Parag Chaturvedi

10/8, Lower Ground Floor
Sarvopriya Vihar
New Delhi - 110065

শক্তি সাধনায় দুর্গাই হবেন কালী
জয় মা কালী, জয় বাঙ্গালি

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

১৮৯৮ সালের আগস্ট মাস, স্বামীজী কাশ্মীরের জাগ্রত দেবীস্থান ক্ষীরভবানী মন্দিরে পুজো দিতে গিয়ে দেখলেন মন্দিরের নিদারুণ ভগ্নদশা। মনে তীব্র ক্রোধ আর হতাশা জন্ম নিল, ভিতরে ভিতরে প্রবল বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন মন্দির ধ্বংসকারী মুসলমানদের উপর। 'যবনেরা এসে তাঁর মন্দির ধ্বংস করে গেল, তবু এখনকার লোকগুলি কিছুই করল না। আমি যদি তখন থাকতাম, তবে কখনো চুপ করে সে-দৃশ্য দেখতে পারতাম না।' পরধর্মীদের আগ্রাসনে অন্য ধর্মীয় নেতার মনে যেমন ক্রোধের উদয় হয়, তেমনই হলো স্বামীজীর। তারপরই শুনলেন সেই দৈববাণী, 'আমার ইচ্ছা আমি ভাঙা মন্দিরে বাস করব। ইচ্ছা করলে আমি কি এখনই এখানে সাততলা সোনার মন্দির তুলতে পারি না? তুই কী করতে পারিস?'

তিনি মহাকালের উপরই সেদিন ছেড়ে দিয়েছিলেন সমস্ত দায়ভার, তুরীয় অবস্থায় তাঁর উপর মহাশক্তি ভর করল। কিন্তু সুদূরের সলতে পাকানোর দায়িত্ব নিয়ে নিলেন। লিখলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবিতা 'Kali the Mother', যার পরতে পরতে মহাকালীর তাণ্ডব, প্রগাঢ় মানসিক অভিভবে ধ্বংসলীলা। আপন বোধকে লক্ষ কোটি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিলেন তিনি। কবিতাটি ভারতের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাছে এক আবশ্যিক পাঠ হয়ে দাঁড়ালো। আর সেই স্বাধীনতা সংগ্রামও হয়ে দাঁড়ালো হিন্দু জাতীয়তাবাদ। অস্বীকার করার উপায় নেই, যে নবজাগরণের ফলে বাঙ্গালি তথা ভারতবাসী সুপ্তিদশা থেকে জেগে উঠেছিল, তা আদতে ছিল হিন্দু নবজাগরণ; তার মধ্যে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দের মতো মহান মনীষীরা কেউই বাদ ছিলেন না।

স্বামীজীর 'Kali the Mother' কবিতার মধ্যে রয়েছে তাঁর ভাব-শিষ্যদের প্রতি শক্তি-সাধনার আহ্বান, যার ধারাপাত

ক্ষীরভবানী মন্দিরকেও লাঞ্ছনা মুক্ত করতে পারে, পারে ভারতীয় উপমহাদেশে ছড়ানো ছিটানো অনেকানেক দেবালয়ের লাঞ্ছনা মুক্তি। সে কাজ স্বামীজীর একলার পক্ষে সম্ভব নয়; অনেক স্বামীজীর জন্ম নিতে হয়। স্বামীজী তখন ক্লান্ত, অসুস্থ; সনাতনী ধর্মের প্রচার ও প্রসারে জীবনী-শক্তি নিঃশেষ করে ফেলেছেন। তাই কাব্যের মোড়কে স্পষ্টই বার্তা দিলেন আগামী প্রজন্মের প্রতি। দীপ হাতে হাজির হলেন শ্রীঅরবিন্দ; লিখলেন 'ভবানী-ভারতী'। 'শ্যামা জননীর মহাপ্রসাদ' শ্যামাপ্রসাদের বলিদান হলো কাশ্মীরে। তারই ধারাবাহিকতায় স্বামীজীর ১২০ বছর বাদে আর এক নরেন্দ্রর হাতে দীপাধার পৌঁছলো। অমিতবিক্রমে জম্মু-কাশ্মীর থেকে বিতর্কিত অস্থায়ী ধারা বিলোপ করে সেই কর্তব্যেরই অখণ্ড ধারাবাহিকতা সারলেন তিনি। সেই ধারার কাজ এখনও চলছে। কেবল কাশ্মীরের ইতিহাসই বদল হচ্ছে না, বদল হচ্ছে তার ভূগোলও। এ এক অমিত-অভ্যুত্থান, অমিত-বিক্রম। অতীতের ভুলের পাহাড়কে সরানোর কাজ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ শাক্ত কবিতা মৃত্যুরূপা মাতা, 'Kali the Mother' কবিতা, 'Who dares misery love,/And hug the form of Death,/Dance in Destruction's,/To him the Mother comes.' (সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,/কাল-নৃত্য করে উপভোগ,/মাতৃরূপা তারি কাছে আসে)। এ যে ভয়ংকরের পুজো, মৃত্যুর পুজো, এ যে কাপুরুষের আত্মহত্যা নয়, এ যে শক্তিমানের মৃত্যু সম্ভাষণ! এক এক করে স্বামীজী লিখে চলেছেন মৃত্যুরূপা কালীকে নিয়ে; 'নাচুক তাহাতে শ্যামা', 'My play is done', 'Who knows how Mother plays'. ঠিকই তো! জগজ্জননীর অনন্তলীলার কে কবে তল পেয়েছে? 'কেবা সে পামর দুঃখে যার ভালোবাসা?' হৃদয়কে শ্মশান করে তুলে, স্বার্থ-সাধ- মানকে চূর্ণ করে সেখানে নাচাতে চান শ্যামা-মাকে! মৃত্যু, অন্ধকার, সংগ্রাম ও দুঃখচেতনার এই অন্তর্নিহিত জারিত করেছিল ভগিনী নিবেদিতাকে। নিবেদিতা ১৮৯৯ সালের নভেম্বরে পাশ্চাত্যে যাত্রাকালে স্বামীজীর কাছ থেকে গভীরভাবে জেনে নিলেন কালী-দর্শন। তিনিও লিখলেন গ্রন্থ, 'Kali the Mother'; এ যেন মনোময়ী কালী, একেবারেই নিবেদিতার নিজস্বতার ছোঁয়া। তার আগে স্বামীজী তাঁকে দিয়ে বঙ্গদেশে কালীতত্ত্ব প্রচার করিয়ে নিয়েছেন। ১৮৯৮ সালের ১১ মার্চ কলকাতার স্টার থিয়েটারে নিবেদিতা বক্তা, ১৮৯৯ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি অ্যালবার্ট হলে এবং ১৮৯৯ সালের ২৮ মে কালীঘাট মন্দিরেও নিবেদিতার ভাষণ। নিবেদিতার নিজের উপর বিশ্বাস তখন পুরোদমে। এই কালী ভাবনার মধ্যে ফুটে উঠছে মানুষের মনের বিপুল শক্তির আলোড়নের প্রতিচ্ছবি, কালী-সদাশিবের তত্ত্ব। নিবেদিতা লিখতে পেরেছেন এই জন্যই, ততদিনে তাঁর খ্রিস্টীয় সংস্কারের ওপরে কালীর কৃষ্ণছায়াপাতের সূচনা হয়েছে। সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্যের পরত সরে যাচ্ছে, কোনো লাস্যময়ীর লীলাচাতুরীর হালকা ওড়নার ঢাকা সরে যাচ্ছে। যে শিবকালী সাধনাকে জাতি-গঠনের কাজে লাগানোর কথা বলছেন স্বামীজী, সেই শিব-কালীকেই ভারতের চৈতন্য হিসেবে রূপায়িত করলেন নিবেদিতা। ভয়ংকরী কালী যেন জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ নারীর ভয়ংকর বাসনা! ভারতমাতার এক স্বরূপ হচ্ছেন মহাকালী। যিনি ব্রহ্মময়ী, তিনিই দেশমাতৃকা, তিনিই ভারতমাতা। তাই দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির ছিল বিপ্লবীদের এক মহাশক্তির আধার। রামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দ এই ত্রয়ী ছিলেন মহাবিপ্লবের প্রতীক। শ্রীরামকৃষ্ণের পদধূলিরঞ্জিত মৃত্তিকা বিপ্লবীদের কাছে ছিল এক tremendous explosive material. শ্রীরামকৃষ্ণ একবার নরেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, 'মনে রাখিস ইংরেজরাই এদেশের সর্বনাশ করছে।' স্বামীজী বলেছিলেন আগামী পঞ্চাশ বছর ভারতমাতাই ভারতবাসীর একমাত্র উপাস্য দেবতা। নিবেদিতার আদর্শে ভারতমাতার ছবি আঁকলেন অবনীন্দ্রনাথ। অখণ্ড ভারতবর্ষের সাধনায় ব্রতী হলেন অরবিন্দ। ডি.এল. রায় লিখলেন, 'চল সমরে দিব জীবন ঢালি/জয় মা ভারত, জয় মা কালী!'

পুলিশের নজরও ছিল মঠ মিশন ও তার শাখাকেন্দ্রগুলিতে; ছিল জয়রামবাটিতে মায়ের ভিটেতে। মা সারদার ধারণা ছিল, নরেন বেঁচে থাকলে 'কোম্পানি' তাকে জেলে ভরে রাখত। ১৯০৮ সালের ২ মে মানিকতলা বোমা মামলার অন্যতম আসামিকে ৪৮নং গ্রে স্ট্রিটের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তারের সময় পুলিশ সুপার গ্রেগান সাহেব অরবিন্দের শিয়রের কাছ থেকে আবিষ্কার করেছিলেন দক্ষিণেশ্বরের পবিত্র মাটিপূর্ণ একটি পাত্র। অগ্নিযুগের বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ বলেছিলেন, তার রক্তে যে চির বিপ্লবের নেশা, তা স্বামীজীর স্পর্শে সঞ্জীবিত। স্বামীজী এই শক্তি আবার পেয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে। তাই বোমা-বিপ্লবীর আদানপ্রদান ও মত বিনিময়ের গুপ্ত ঠিকানা ছিল দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতলার নির্জন স্থল। তারই পাশে আড়িয়াদহের বাচস্পতি পাড়ায় এক পুরোনো নির্জন বাড়িতে তৈরি হতো বোমাবারুদ; তা বিপ্লবীরা ছড়িয়ে দিতেন ভারতের নানাস্থানে। 'দক্ষিণেশ্বর বোমা মামলা' ছিল তারই অনুষঙ্গজাত এক গুরুত্বপূর্ণ আইনি পদক্ষেপ।

স্বাধীনতাকামী গুপ্ত বিপ্লবী সমিতিগুলির মূল শক্তি ছিল বাঙ্গলার শক্তিভূমি। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অনুশীলন তত্ত্বের আদর্শে ব্যায়ামের আখড়ার আড়ালে বঙ্গদেশে স্থাপিত হয় সশস্ত্র ব্রিটিশ বিরোধী সংগঠন 'অনুশীলন সমিতি'। এই সংগঠনে যুক্ত ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ স্বয়ং। শাক্তদর্শনে বিশ্বাসী ছিল এই সংগঠন। সিস্টার নিবেদিতা, স্বামী সারদানন্দ, জাপানি কাকুজো ওকাকুরার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল সংগঠনের। শরীরচর্চা, লাঠিখেলা, তরোয়াল খেলা, ড্রিল, মুষ্টিযুদ্ধ, কুস্তি শিখতেন সদস্যরা। পাঠ নিতেন নৈতিকতার এবং জাতীয় আধ্যাত্মিকতার। স্বামীজীর দর্শন ও দেশপ্রেম তাদের নবচেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছিল। নিবেদিতার বাসাও ছিল গুপ্ত সমিতির এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র।

আগামীদিনের জন্য সমস্ত দিক থেকে ভারতবর্ষ প্রস্তুত থাকুক— এটাই শ্রীঅরবিন্দের বাণী, এটাই স্বামীজীর কথা। স্বামীজী বলতেন, 'স্বাধীন হওয়ার পর আরও পঞ্চাশ বছর লাগবে উঠতে। আর তখন উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে আরোহণ করবে ভারত।' স্বাধীন হবার পঞ্চাশ পেরোবার পরই অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে এসেছে ভারত; নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, তিনি তাঁরই পথ অনুসরণ করে চলেছেন। এ অখণ্ড ভারতবর্ষের মানচিত্রকে সামনে রেখে এ যেন শক্তিমন্ত্রের ধ্যান। এই ধ্যানমন্ত্র তাঁরা কোথায় পেলেন?

বঙ্গসংস্কৃতির আঙিনা থেকেই একদিন বঙ্গীয় যুবকদের শক্তির উৎসকে খুঁজে দিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ। ব্রিটিশ ভারত তখন তোলপাড়। উপস্থাপিত হলো বাঙ্গলার শক্তি-সাধনার এক অনন্য ধারা। যে বাঙ্গলা তন্ত্রের পীঠস্থান, যেখানে আদ্যাশক্তি লীলাময়ী, যেখানে ভগবান মাতৃরূপে সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্যে প্রকাশিত, তারই আদলে দেশমাতৃকাকে দেখার চৈতন্য উদিত হলো। যুবকেরা তাঁরই মধ্যে খুঁজে নিলেন অফুরন্ত প্রাণশক্তির উপাদান। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, 'কোন অমানুষ/তোমার বেদনা হতে না পাইবে বল!' শক্তি ও সুন্দরের যাবতীয় ভাণ্ডার যে মাতৃদেবীর মধ্যেই নিহিত, তা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 'দুর্গাস্তোত্র'-এ।

দুর্গাস্তোত্র ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী মানুষের কাছে একটি অন্যতম সৃষ্টি, পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামী যুবকদের জপমন্ত্র। দেবী দুর্গা এখানে দেশজননীরূপে প্রতিভাত। সকল কাজেই দুর্গাপূজার প্রয়োজনীয়তা, তিমিরবিনাশী আভায় লড়াইয়ে পথ, 'বীরমার্গপ্রদর্শিনী, এস! আর বিসর্জন করিব না। আমাদের অখিল জীবন অনবিচ্ছিন্ন দুর্গাপূজা, আমাদের সর্ব্ব কার্য্য অবিরত পবিত্র প্রেমময় শক্তিময় মাতৃসেবাব্রত হউক, এই প্রার্থনা মাতঃ, উর বঙ্গদেশে, প্রকাশ হও।' প্রেক্ষাপট বঙ্গদেশ হলেও, বাঙ্গলার তরুণদলের একাত্ম প্রার্থনা হলেও, তা আসলে ভারত-বাণী; তা আসলে বিশ্বজননীর বোধ। মা দুর্গা এখানে কখন যেন বঙ্গভূমি অতিক্রম করে ভারতমাতা হয়েছেন, হয়ে উঠেছেন জগদম্বে। আজও যখন বাঙ্গালি ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ছে জাতীয় বিকাশের ধারাপাতে, নানান চোরাস্রোতে তলিয়ে যাচ্ছে তার যাবতীয় ক্ষাত্রবল, ভীরু-পলায়নপর জাতি হিসেবে প্রতিভাত হচ্ছে অনুক্ষণ, তখন বাঙ্গালি যেন পুনর্পাঠ করে দুর্গাস্তোত্রের টেক্সট। আর নিমেষে শক্তিমান হয়ে অশুভশক্তির টুঁটি চেপে ধরতে পারে। দুর্গাস্তোত্রে পাচ্ছি, মাতঃ দুর্গে! কালীরূপিণী, নৃমুণ্ডমালিনী দিগম্বরী, কৃপাণপাণি দেবি অসুরবিনাশিনি! ক্রূর নিনাদে অন্তঃস্থ রিপু বিনাশ কর। একটিও যেন আমাদের ভিতরে জীবিত না থাকে, বিমল নির্মল যেন হই, এই প্রার্থনা, মাতঃ, প্রকাশ হও। □

With Best Compliments
From :-

NIPHA EXPORTS PVT. LIMITED

KOLKATA

With Best Compliments from :-

SOUMIK CHAKRABORTY

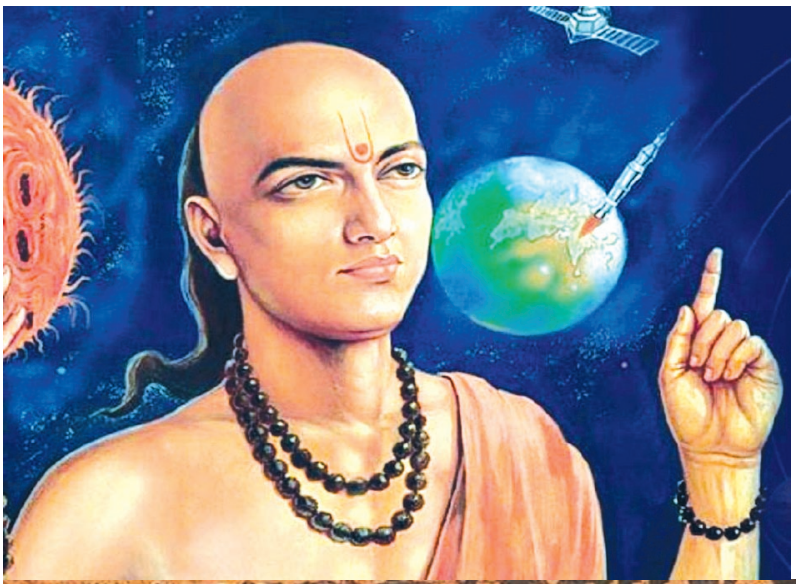

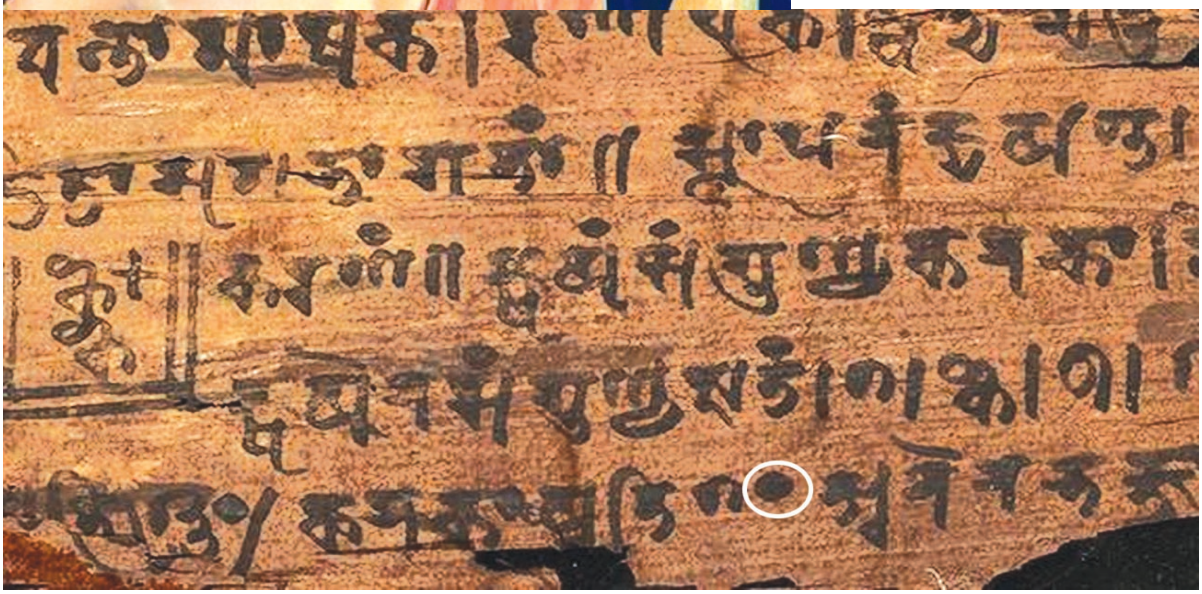

শূন্য'র বয়স কি মাত্র দু' হাজার বছর !

দুর্গাপদ ঘোষ

মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রের কাছে একটা ছোট্ট মন্দির। প্রায় পরিত্যক্ত পোড়ো মন্দিরই বলা চলে। তার গায়ে খোদাই করা লিপি। এরকম নানা ধরনের লিপি দেখতে পাওয়া যায় আরও অনেক প্রাচীন মন্দিরের গায়ে। কিন্তু মন্দির গাত্রের এই লিপি থেকে এমন একটা চিহ্ন মেলে যা নিয়ে প্রায় বিশ্বজুড়ে হইচই পড়ে যায়। প্রশ্ন ওঠে, পিথাগোরাস না কোনো ভারতীয় গণিতজ্ঞ, শূন্য (০) সংখ্যার প্রথম আবিষ্কারক কে? গণিত বিষয়ক হলেও প্রশ্নটা আদতে একই সঙ্গে বিজ্ঞান, অধ্যাত্ম দর্শন ও ইতিহাস বিষয়কও। যা থেকে কোনো দেশের, কোনো জাতির উদ্ভাবনী শক্তির মেধা, গবেষণা বা আর্যত্ব, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সভ্যতার প্রাচীনত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। সেই অনুসন্ধান কেবল যে ঐতিহাসিক, প্রত্নতত্ত্ববিদ, নৃতত্ত্ববিদ ও সমাজবিদরা করে এসেছেন তাই নয়। ক্ষেত্রবিশেষে বিজ্ঞানী এমনকী পরমাণু বিজ্ঞানীরাও করেছেন। বিশ্ববিশ্রুত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন বোডলেয়ান লাইব্রেরির তৎকালীন প্রধান রিচার্ড ওভেনডেন ২০১৮ সালের আগস্ট মাসে ভারতের একটা বিশেষ পাণ্ডুলিপি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে মন্তব্য করেন যে, 'পাণ্ডুলিপির কাল নির্ণয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের পক্ষে তো বটেই, গণিত শাস্ত্রের ইতিহাসের পক্ষেও।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স কলেজের প্রয়াত অধ্যাপক বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর জন্মশতবর্ষ ছিল ১৯৯৪ সালে। এই উপলক্ষ্যে কলকাতার 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অব সায়েন্স' এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করে। আলোচ্য ছিল সত্যেন্দ্রনাথের গবেষণার বিষয়— Nuclear Physics বা কণা পদার্থবিদ্যা। বলা বাহুল্য, বিষয়টা Absolute Science বা পরিপূর্ণ বিজ্ঞান। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আসা প্রথম সারির বিজ্ঞানীদের মধ্যে ছিলেন আমেরিকার হার্ভার্ড ও প্রিন্সটন

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডেভিড গ্রসও। পরে পদার্থ বিজ্ঞানে যিনি নোবেল পুরস্কার পান। সম্মেলনের উদ্যোক্তরা একদিন সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেন। সেখানে গ্রস প্রায় একটা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দেন। কোনো রকম জড়তা না রেখে মত প্রকাশ করেন যে, 'ভারতবর্ষে ০-র মতো একটা সাংঘাতিক জিনিস আবিষ্কৃত হয়েছিল।' আগে থেকে এ সম্পর্কে সবার একটা ভাসা-ভাসা ধারণা থাকলেও গ্রসের মতো একজন বিজ্ঞানীর মুখে একথা প্রকাশ পাওয়ায় সম্মেলনে তখন একটা সূচ পড়লেও বোধহয় তার শব্দ শোনা যেত। নিশ্চুপ সাংবাদিক মহল এবং মঞ্চে উপস্থিত বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানীরা বুঝলেন, বিজ্ঞানীর মন কেবল পদার্থের রহস্য খোঁজে না। ইতিহাসের, সংস্কৃতির ইতিবৃত্তও জানতে চায়।

ফিরে আসা যাক সেই অখ্যাত মন্দিরের লিপিতে। যাতে লেখা রয়েছে মন্দিরের সীমানা হলো ২৭০ ও ১৮৭ হাত (এক হাত = ১৮ ইঞ্চি)। দৈনিক পূজা উপাচার ৫০টি মালা। ২৭০ ও ৫০ দুই সংখ্যাতেই রয়েছে দুটি ০-শূন্য। মন্দিরে স্থাপিত একটি ফলক থেকে জানা যাচ্ছে তার স্থাপনাকাল ৮৭৫-৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ। এই সূত্রে বিশেষজ্ঞরা ধরে নিয়েছিলেন ভারতে শূন্যের প্রচলন হয় ওই নবম শতকে। যদিও তার আগে ব্রহ্মগুপ্তর গ্রন্থে ০-র উল্লেখ মিলেছিল। কিন্তু দুটি ধারণাকেই আবার প্রমাণ করে দিয়েছে স্বনামধন্য বোডলেয়ান গ্রন্থাগার। এক প্রাচীন পাণ্ডুলিপির কথা প্রকাশ করে তাঁরা জানিয়ে দেন ভারতে তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দীতেও ০-র ব্যবহার চালু ছিল। অর্থাৎ বিশেষজ্ঞদের ধারণার চাইতে কমপক্ষে ৫-৬ শো বছর আগেও ভারতে ০-র ব্যবহার হতো।

বোডলেয়ান কর্তারা কীভাবে জানতে পারলেন একথা! সংস্কৃত ভাষায় দেবনাগরী ও ব্রাহ্মী ছাড়াও কিছু লিপি রয়েছে। তার মধ্যে একটা হলো বাখশালী। এই নামকরণের মূল কারণ বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত পেশওয়ারের কাছে বাখশালী নামে যে গ্রাম আছে তার মাটির নীচে থেকে মেলে এই পাণ্ডুলিপি। চাষ করতে করতে লাঙলের ফলার ডগায় সেটি উঠে আসে। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে। পাশ্চাত্যের এক প্রাচ্যবিদ অগস্টাস ফ্রেডরিক রুডলফ্ হর্নলি কথাটা জানতে পেরে ওই কৃষকের কাছ থেকে সেটি হস্তগত করেন। পাণ্ডুলিপিটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বুঝতে পেরে ১৯০২ সালে বোডলেয়ান লাইব্রেরিকে তা সংরক্ষণের জন্য দিয়ে দেন। গাছের বাকলে ৭০টি পৃষ্ঠায় লেখা সেই পাণ্ডুলিপি তখন থেকে ১২০ বছর ধরে ওই গ্রন্থাগারের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত হচ্ছে। যার প্রায় প্রত্যেক পৃষ্ঠায় রয়েছে অনেকগুলো করে ০। সব মিলিয়ে বেশ কয়েক শো। দীর্ঘকাল ধরে মাটির তলায় পড়ে থাকার কারণে পাণ্ডুলিপিটির অবস্থা হয়েছে জরাজীর্ণ, প্রায় ঝুরঝুরে। সেজন্য বোডলেয়ান কর্তৃপক্ষ কাউকে তা নাড়াচাড়া বা ঘাঁটাঘাঁটি করতে দেন না। বাইরে বাইরে আপাত দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে একজন জাপানি বিশেষজ্ঞ ড. হায়াশি তাকাওয়ের অনুমান, এটা লেখা হয়েছিল অষ্টম থেকে দ্বাদশ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। কিন্তু ড. তাকাওয়ের এই মতকে পণ্ডিত মহল নির্বিচারে মেনে নিতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত প্রত্নবস্তুর বয়স নির্ণয়ের কার্বন ডেটিং পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। জানিয়ে দেওয়া হয়, বাখশালী পাণ্ডুলিপিটি লেখা হয়েছিল তৃতীয়-চতুর্থ খ্রিস্টাব্দে।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বাখশালী পাণ্ডুলিপিটির বয়স না হয় নির্ধারিত হলো। কিন্তু তার মানে তো এই নয় যে ০-র আবিষ্কার তখন থেকেই হয়েছে! তাহলে তার আবিষ্কার কবে এবং কোথায়! আবিষ্কারকই-বা কে? প্রশ্নটা যত সহজ উত্তর ঠিক তার বিপরীত। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিশেষজ্ঞদের মধ্যে এই বিতর্ক ছিল প্রবল। অনেক বিশেষজ্ঞই নিজের দেশের কোলে ঝোল টানার চেষ্টা করেছেন। ব্রিটিশ পণ্ডিতরা, বিশেষ করে জর্জ রাশবি কে— প্রমাণ করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন যে ০-র আবিষ্কার হয়েছে ইউরোপে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বেশিরভাগ ইউরোপীয় পণ্ডিত প্রায় সমস্ত ব্যাপারেই জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা-সংস্কৃতির গোড়াপত্তনের ইতিহাসের মূল কেন্দ্র বা বেস হিসাবে গ্রিসকে প্রস্থাপিত করার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। ভাবখানা এমন যেন সবকিছুরই উৎপত্তি হয়েছে গ্রিস বা ইউরোপ থেকে। সে দর্শনতত্ত্বই হোক কিংবা বিজ্ঞান, এমনকী বাস্তুতন্ত্রও। কিন্তু হরপ্পীয় ও ব্যাবলনীয় সভ্যতার আবিষ্কার তাঁদের এই চেষ্টার মূলে কুঠারাঘাত করেছে। অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের দাবি নস্যাৎ করে দিয়েছেন অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতই। জর্জ রাশবি কে-র দাবিও খারিজ করে দেন একজন ফরাসি পুরাতাত্ত্বিক জর্জ কোদে। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে কোদে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বুলেটিন অব দ্য স্কুল অব ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ' জার্নালে প্রকাশিত তাঁর এক প্রবন্ধে পরিষ্কার জানিয়ে দেন ০-র আবিষ্কার হয়েছে ভারতবর্ষে। প্রমাণ হিসাবে তুলে ধরেন কাম্বোডিয়ায় মেকং নদীর ধারে স্বাম্বর নামের এক জায়গায় একটা প্রাচীন মন্দিরে লিপির সঙ্গে সংখ্যাখচিত একটি পাথর খণ্ডের। তাতে খেমের ভাষায় লেখা একটি বাক্য। যার অর্থ হলো, পঞ্চমী তিথির দিন ৬০৫ বছরে পড়ল শক যুগ।

ইতিহাসের ভাষ্য অনুসারে শক যুগের সূচনা হয়েছিল ৭৮ খ্রিস্টাব্দে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের একাংশের তত্ত্ব মোতাবেক আরব বণিকরা ইউরোপ হয়ে ০-কে ভারতে নিয়ে গিয়েছিলেন। অর্থাৎ ০-র আবিষ্কার হয়েছিল ইউরোপে আর সেখান থেকে আরব বণিকদের মাধ্যমে তা পৌঁছেছিল ভারতবর্ষে। কিন্তু উল্লেখিত পাথর খণ্ডে যে সময়ের কথা খোদিত আছে তখন পর্যন্ত আরব ব্যবসায়ীরা তো ভারতে আসেননি যে তাঁদের হাত ধরে ভারতে ০-সংখ্যা পৌঁছবে! ওই পাথর খণ্ড থেকে দুটো জিনিস পাওয়া যাচ্ছে। এক, তিথি-নক্ষত্রের গণনার ব্যাপারটা ভারতে অনেক কাল আগে থেকে শুরু হয়েছিল। দুই, বাখশালের মন্দিরে পাওয়া লিপিতে ০-গুলি রয়েছে সংখ্যার পরে। কিন্তু স্বাম্বরের মন্দিরে পাওয়া এই খেমের ভাষায় দেখা যাচ্ছে ০ রয়েছে দুই সংখ্যার মাঝখানেও। অর্থাৎ সংখ্যা গণনায় ০-র ব্যবহার চলে আসছে অনেক আগে থেকে এবং রীতিমতো পদ্ধতিগত ভাবে। আরও একটা বিষয় হলো ০ আবিষ্কারের প্রচলিত ধারণার প্রায় ৯০০ বছর অগেও ভারতে শূন্যের পদ্ধতিগত ব্যবহার চালু ছিল। ভারতের প্রাচীন গৌরব সম্পর্কে স্বভাবজাত সন্দিহানরা প্রশ্ন তুলতে পারেন এবং প্রশ্ন উঠেওছে যে, কম্বোডিয়ায় প্রাপ্ত শূন্য ভারতের হলো কী করে? তারও উত্তর দিয়েছেন ওই ফরাসি পুরাবিদ। তাঁর বক্তব্য, তখন গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতিই শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছিল। সেই সূত্রে ভারত থেকে তা পৌঁছেছিল কাম্বোডিয়ায়।

তবে এটাও অনেক পরের ইতিহাস।

কাম্বোডিয়া নামকরণ মহাভারতের ঋষি কম্বু-কৌণ্ডিণ্যর নাম থেকে। তা ৫ হাজার বছর আগের কথা। যতদূর জানা যায়, ঋষি কম্বুই প্রথম ওই অঞ্চলে ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রসারে গিয়েছিলেন। যেমন ঋষি অগস্ত্য রামায়ণের কালে গিয়েছিলেন পাতাল বা রসাতল (রস অর্থে জল এবং অতল অর্থাৎ তলহীন সমুদ্র বেষ্টিত) রাজ্য বর্তমান ইন্দোনেশিয়ায়। মহাভারতের কালে বর্তমানে আফগানিস্তানের কান্দাহারের মতো কাম্বোডিয়াও ছিল বস্তুত মহাভারত বা বৃহত্তর ভারতের অঙ্গবিশেষ। মহাভারতের উদ্যোগ পর্ব থেকে জানতে পারা যায় যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৌরবদের পক্ষে যোগ দেওয়ানোর জন্য কর্ণ কম্বোজের রাজার কাছে গিয়েছিলেন। তখন কম্বোডিয়া ছিল কম্বোজ। কান্দাহারের নাম ছিল গান্ধার।

পণ্ডিতদের মতে বেদের চতুর্থ পর্ব অথর্ববেদের সময়কাল ছিল মোটামুটি দেড় হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত। তার কয়েকশো বছর পরে শুরু হয় মৌর্যযুগ। ঋক থেকে অথর্ব চারটি বেদের কালেই যাগযজ্ঞের জন্য যেসব যজ্ঞবেদী নির্মাণ করা হতো তা যে কৌণিক মাপজোক তথা জ্যামিতিক নকশা ধরে তা এখন সর্বজনবিদিত। অর্থাৎ জ্যামিতির আবিষ্কারও প্রথম ভারতেই। তবে অকুপণ স্বীকারোক্তি— বেদের কালে ০-র আবিষ্কার বা ব্যবহার হয়েছিল কিনা এই প্রবন্ধকারের তা জানা নেই। কিন্তু তিথি-নক্ষত্রের অবস্থান এবং সেই সূত্রে সময়, কাল এমনকী ক্ষণ গণনা যে একেবারে নিখুঁত ভাবে হতো তার নানা প্রমাণ মেলে। রামায়ণ রচয়িতা মহর্ষি বাল্মীকি এবং মহাভারত রচয়িতা মহর্ষি বেদব্যাস উভয়েই তাঁদের গ্রন্থে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সময়কাল বর্ণনা করে গেছেন গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান তথা তিথি-নক্ষত্র, রাশি চক্রের অবস্থানের বিচারে। ০ ব্যাতিরেকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের অতি সূক্ষ্ম গণনা সম্ভব কিনা তা বলাবাহুল্য গভীর গবেষণার বিষয়। আর যে ব্রহ্মাণ্ড নিয়ে জ্যোতির্গণনা সেই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডই যে একটা মহা শূন্য, অখণ্ড মণ্ডলাকারং ০ (A Big Zero) এটা কে না জানে! বলা নিষ্প্রয়োজন যে এই অধ্যাত্মিক ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আবিষ্কারকও এই ভারতবর্ষ। সুতরাং কম্বোডিয়ার মন্দির থেকে প্রাপ্ত তথ্য কিংবা কোনো সংখ্যা যে আদতে ভারতেরই তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশের জায়গা নেই।

ভারতই যে ০-র আবিষ্কারক একথা অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতও নানা সময়ে স্বীকার করেছেন। তবে ঠিক কবে এবং কোন গবেষকের মেধাপ্রসূত ইতিহাস তার স্পষ্ট উত্তর নেই। কিন্তু যাঁরা মহাশূন্যে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান এবং তাদের গতি সঞ্চালনের সূক্ষ্ম বিধি অনুসারে নির্ভুল হিসাব কষতে জানতেন তাঁরা যে ০-কে বাদ দিয়ে তা করতেন অথবা ০-হীন গণনা বা অঙ্ক কষতে জানতেন না এরকম ধারণা করাটা কি মেধা নিষ্ণাত! মনে হয়— না। কেননা, মহাশূন্যে নক্ষত্র রাশির গতিবিধির হিসেব হয়ে থাকে ক্ষণ, পল ইত্যাদি সেকেন্ডেরও ভগ্নাংশের হিসেবে। ভারতে বহু প্রাচীনকাল থেকে এখনও অবধি সেই গণনা একেবারে নিখুঁতভাবে চলে আসছে। একশো এমনকী হাজার বছর আগেই বলে দেওয়া যায় সূর্য কিংবা চন্দ্রে ঠিক কবে, কখন এবং ঠিক কোন ক্ষণে গ্রহণ লাগবে, কোন মুহূর্তে ছাড়বে। ০ ব্যাতিরেকে এই সূক্ষ্ম গণনা যদি অসম্ভব হয় তাহলে অনুমান করতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে ভারতে ০-র আবিষ্কার অন্তত ৭-৮ হাজার বছরের কম হবে না। জ্যোতির্গণনার ইতিবৃত্ত ঘাঁটতে গিয়ে অনেকে আর্যভট্ট, খনা-বরাহ-র কথা বলেন। কিন্তু কালের হিসেবে তাঁরা তো বলতে গেলে হাল আমলের।

বস্তুত আমাদের আধুনিককালের পণ্ডিতদের যাবতীয় ধ্যানধারণা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মগজপ্রসূত ধারণা ও মতের কাছে বন্ধকীকৃত। বেশিরভাগ পাশ্চাত্য পণ্ডিত এবং এদেশে তাঁদের কচ্ছধারীরা কোনো কিছুকেই দুর্বোধ্য কারণে খ্রিস্টাব্দের ওপারে দেখতে অভ্যস্ত নন। তাঁদের কাছে তার ওপারে সমস্ত জ্ঞানের পরিধিই অন্ধকার। মৌর্যযুগের ওপার প্রাগৈতিহাসিক কিংবা Historical missing Link--- ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কছিন্ন। জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞ ব্রহ্মগুপ্তর 'ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত' নাকি পেশ করছে যে ০-কে সংখ্যা বা অঙ্ক হিসেবে ব্যবহারের সেটাই প্রথম নমুনা। কিন্তু ওই গ্রন্থ রচনার কাল খ্রিস্টাব্দ শুরু হওয়ার ৬শো বছর পরে ৬২৮ অব্দে। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি গণিতজ্ঞ পিয়ের-সিমো লাপ্লা বলেছিলেন, 'সব সংখ্যা কেবল ১০টি চিহ্ন দিয়ে প্রকাশের মেধাসম্পন্ন কৌশল শিখিয়েছে ভারতবর্ষ।' পাশাপাশি ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক জর্জ ঘিভার্গিস জোসেফের মত, এখন থেকে দু' হাজার বছর আগে নাম না জানা কোনও এক ভারতীয় গণিতজ্ঞের মাথায় এসেছিল ০-র ধারণা। ওই ফরাসি গণিতজ্ঞের কথাও যদি ধরা হয় তাহলেও তো ০ সম্পর্কে ব্রহ্মগুপ্ত-তত্ত্ব ধোপে টিকছে না। তবে এক্ষেত্রেও সেই খ্রিস্টাব্দের গণ্ডি এবং 'ধারণা'।

শূন্য-র অন্য অর্থও বড়ো তাৎপর্যপূর্ণ— সবকিছু থেকে মুক্তি। নির্বাণ। অধ্যাপক ঘিভার্গিসের আরও বক্তব্য, শূন্য সম্পর্কে এই আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক চিন্তা-চেতনাকে গণিতে ০-র আকার দিয়েছিলেন সেই নাম না জানা ভারতীয় গণিতজ্ঞ। তখনই আবিষ্কৃত হয়েছিল গণিতশাস্ত্রে মহামূল্যবান সংখ্যা— ০। ভারতীয় মেধা সম্পর্কে এটা অতি উচ্চ প্রশংসা সন্দেহ নেই। কিন্তু এখানেও সেই খ্রিস্টাব্দের গণ্ডি। খ্রিস্টপূর্বের কথা নেই। তবে সময়কাল নিয়ে যিনি যে অব্দেই কোটরাগত থাকুন না কেন, একবাক্যে প্রায় সকলেরই রায় অবশ্য একটাই— ০-র আবিষ্কার হয়েছে ভারতেই। এবং 'What has India given to the World', সেটা বিশ্বের অন্য কোনো দেশ, অন্য কোনও দেশবাসী দেননি, দিতে পারেননি। না গ্রিস, না ইউরোপ, না চীন। মন্তব্যটা এমন একজন পণ্ডিতের যিনি গণিত বিষয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এবং একাধিক গ্রন্থের লেখক অ্যালেক্স বেলোস। তাঁর এই মন্তব্যের সূত্র ধরে বলা যেতে পারে ভারত বিশ্বকে যা দিয়েছে তাহলো 'Nothing', 'কিছু নয়', detouchment, নির্বাণ— শূন্য। জাগতিক অর্থে যার মূল্য নেই। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ অর্থে অমূল্য। বৃহত্তর গণ্ডিতে যা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড। অসীম মহাশূন্য। এটা যেমন ভারতীয় দর্শনতত্ত্ব তেমনি মহামূল্যবান গাণিতিক সংখ্যাও। ঘুরে ফিরে আবারও সেই বিজ্ঞান ও দর্শন তত্ত্বের জিজ্ঞাসা— ০-র বয়স কি মাত্র দু' হাজার বছর? দুর্ভাগ্যবশত এ বিষয়ে প্রামাণ্য কোনো শিলালেখ কিংবা পাণ্ডুলিপির সন্ধান এখনো পাওয়া যায়নি। প্রশ্নটা শূন্যে— মহাশূন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যিনি যা কিছু বলছেন, মত বা ধারণা প্রকাশ করছেন সেসবও বস্তুত এক-একটা সীমাহীন শূন্য। □

ধূর্ত গাধা

বনের ভেতর দারুণ ধূর্ত থাকত এক গাধা।
মনের সুখে চরত বনে কেউ দিত না বাধা।।
একদিন সে চরতে চরতে বনের ধারে এল।
ঘাসের উপর সিংহের এক চামড়া খুঁজে পেল।।
আনন্দেতে চামড়াখানা সারা গায়ে ঢেকে।
সিংহ সেজে সন্ধ্যেবেলায় যায় সে গাঁয়ের দিকে।।
সিংহ দেখে গাঁয়ের মানুষ পালায় যখন ছুটে।
মনের সুখে খেতের ফসল খায় সে লুটেপুটে।।
খেতের ফসল নিত্য খেয়ে হলো সে মোটা তাজা।
ভাবল বুঝি এবারে সে হলো বনের রাজা।।
চোখ রাঙিয়ে বলত গাধা অন্য পশু সবে।
তোরা আমার খাসের প্রজা, সেলাম করতে হবে।।
একদিন সে চাঁদনি রাতে খুশিতে প্রাণভরে।
খেতের যত ফসল ছিল খেল পেটপুরে।।
সিংহ দেখে পাহারাদার যত সবাই ছিল।
ভয়ের চোটে দিগ্‌বিদিকে সবাই দৌড় দিল।।
এমন সময় গাঁয়ের ভেতর অন্য গাধায় ধরল গান।
তাই না শুনে সিংহমামা করল উঁচু কান।।
ধরল গাধা ভরাপেটে মধ্যরাতের রাগ।
বুঝল যত পাহারাদার নয়কো এতো বাঘ।।
লাটিসোঁটা নিয়ে তারা মাঠের পানে ধায়।
গানের রাজা গাধামশায় তখনও গান গায়।।
ধপাস্ ধপাস পড়ল লাঠি মূর্খ গাধার পিঠে।
মারের চোটে গেল গাধার গানের আমেজ ছুটে।।
মারতে মারতে পাহারাদাররা প্রাণটি কেড়ে নিল।
মূর্খ গাধার রাজা হবার সাধ না পূরণ হলো।।
এমনি করে ধোঁকা দিয়ে যারাই চলতে চায়।
গাধার মতোই করুণ দশা তাদের ভাগ্যে হয়।।

শম্ভুনাথ পাঠক

ভারতের বিপ্লবী

সুশীল সেন

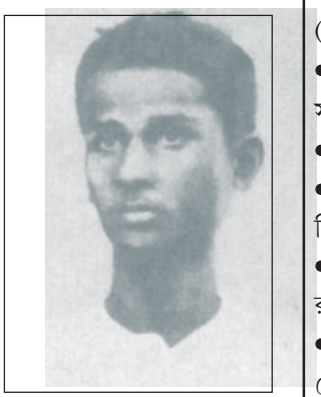

বিপ্লবী সুশীল সেন কলকাতা ন্যাশনাল স্কুলের ছাত্র ছিলেন। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দের বিচারের সময় কিংসফোর্ডের আদালতে জনৈক সার্জেন্ট উত্তেজিত জনতাকে থামাবার জন্য বেত্রাঘাত শুরু করলে তাঁর গায়ে লাগায় তিনি সার্জেন্টকে ঘুষি মারেন। এই অপরাধে তাঁর বেত্রদণ্ড হয়। বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় এক প্রবন্ধে লেখা হয় ' সুশীলের তুড়ি লাফ, ফিরিঙ্গিকে বলায় বাপ্'। ১৯০৮ সালে বিপ্লবীদলে যোগ দিয়ে বোমা তৈরি করা শেখেন। আলিপুর বোমা মামলায় ধরা পড়েন কিন্তু প্রমাণাভাবে ছাড়া পান। পুলিশ ইনসপেক্টর সুরেশ মুখার্জির হত্যা এবং রাজনৈতিক অর্থসংগ্রহ করে ফেরার সময় পদ্মানদীতে পুলিশের দ্বারা আক্রান্ত হন। দুই দলের গুলি চালনার সময় সঙ্গীর গুলিতে তিনি প্রাণ হারান।

জানো কি?

- প্রতি ১০ বছর অন্তর ভারতে জনগণনা (আদমসুমারি) হয়।
- ভারতে প্রথম জনগণনা শুরু হয় ১৮৭২ সালে।
- পৃথিবীর দ্বিতীয় জনবহুল দেশ ভারত।
- ভারতের সর্বাধিক জনবিরল রাজ্য সিকিম।
- আয়তনের দিক থেকে ভারতের বৃহত্তম রাজ্য রাজস্থান।
- আয়তনের দিক থেকে ক্ষুদ্রতম রাজ্য গোয়া।
- ভারতের মোট আয়তন ৩২,৮৭,৭৮৩ বর্গ কিমি।

ভালো কথা

পুজোর আনন্দ

এবার মহালয়ার দিন আমরা কয়েকজন বন্ধু ঠিক করেছিলাম, আমাদের ঠাকুরদা-ঠাকুমা ও দাদু-দিদাকে সঙ্গে নিয়ে ঠাকুর দেখতে বের হবো। সেইমতো অষ্টমীর দিন সকালে আমরা নিজের নিজের দাদু-দিদা, ঠাকুরদা-ঠাকুমাকে নিয়ে ঠাকুর দেখতে বের হই। প্রথমে একটা মণ্ডপে অষ্টমীর অঞ্জলি দিলাম। সঙ্গে আমরা লুচি-মিষ্টি নিয়েছিলাম। পাঁচটি প্রতিমা দেখার পর দুপুরে এক জায়গায় বসে সবাই মিলে খাওয়াদাওয়া করলাম। খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার ঠাকুর দেখা শুরু করলাম। বিকেলে যে যার বাড়ি ফিরে এলাম। দাদু-দিদাদের সঙ্গে আমরাও খুব আনন্দ উপভোগ করেছি। হেঁটে নয়, তিনটে টোটো ভাড়া করেছিলাম।

পূর্ণিমা চক্রবর্তী, একাদশ শ্রেণী, রাণাঘাট, নদীয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) জ গা গা লা	(১) ণ পু কা কা রা লি
(২) গু দ রু ণা	(২) কা মা সু ম কু লি

২৬ সেপ্টেম্বর সংখ্যার উত্তর
(১) বনমানুষ (২) মরণভয়

২৬ সেপ্টেম্বর সংখ্যার উত্তর
(১) নবপত্রিকা (২) নতুনবউ

উত্তরদাতার নাম

(১) শুভজিৎ দাঁ, টিপি রোড, কলকাতা-৬ (২) অভিজিৎ দাঁ, ১৯ কেষ্টদাস পাল লেন, কল-৬। (৩) মৌমিতা দেবনাথ, নিমতা, কলকাতা-৪৯। (৪) বৃষ্টি মাহিন্তা, ১নং গভঃ কলোনি, মালদা।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

With Best Compliments from :-

TITASH MUKHERJEE

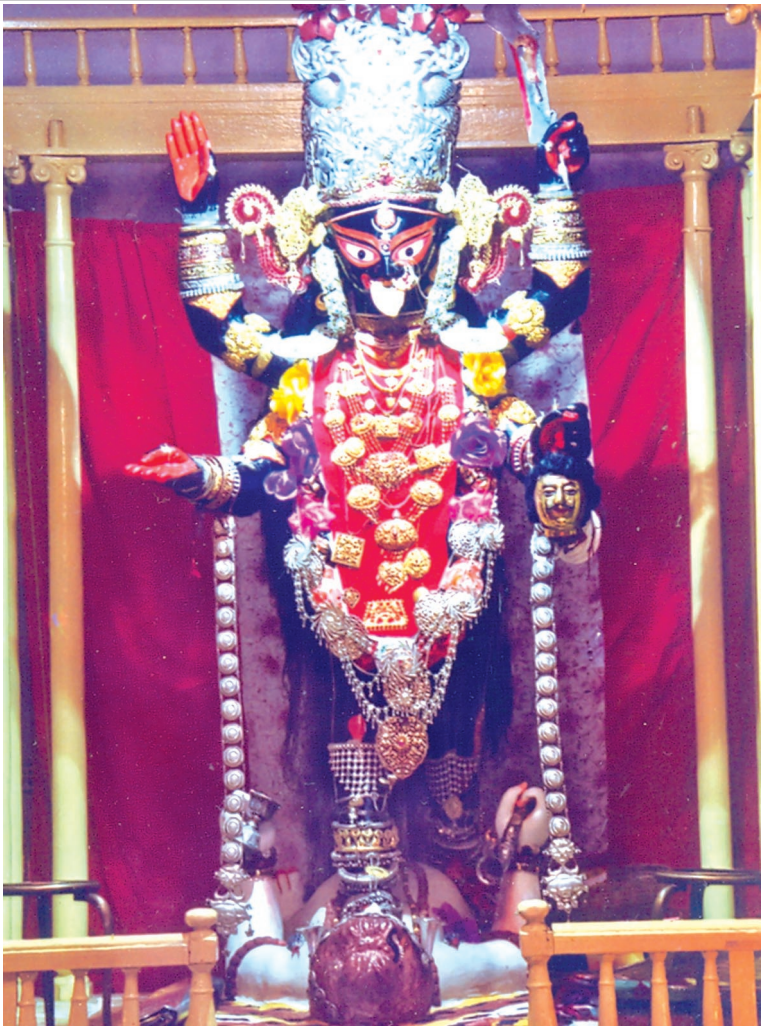

কাঁসারিপাড়া প্রামাণিক বাড়ির ৪০০ বছরের প্রাচীন কালীপুজো

সপ্তর্ষি ঘোষ

দুর্গাপুজো কলকাতার প্রাচীন বহু বনেদি বাড়িতে হয়। তেমনই উত্তর কলকাতার কাঁসারি পাড়ার ৩৭/এ, তারক প্রামাণিক রোডের প্রামাণিক বাড়ির পুজো। তবে এ বাড়িতে কালী ও জগদ্ধাত্রী পুজো দুই-ই হয়। দুটি পুজোই অনেক প্রাচীন। তবে বেশি পুরানো জগদ্ধাত্রী পুজো। এ বাড়িতে আগে দুর্গাপুজো হতো। কিন্তু বিশেষ এক কারণে বন্ধ হয়ে যায়। এখন এই পরিবারে পূজিতা হন মা কালী ও দেবী জগদ্ধাত্রী। তবে কালীপুজো ওঁরা বরাবর করতেন না। কারণ এই কালীপুজোটি আগে ছিল বারোয়ারি। তবে সে পুজো করতেন কংসবণিক সম্প্রদায়। কম-বেশি ১০০ বছর এই বারোয়ারি কালীপুজো সম্পন্ন হওয়ার পর কোনও কারণে এই পুজো করা আর সম্ভব না হওয়ায় প্রামাণিক পরিবার সানন্দে এই পুজোর দায়িত্ব নেন। এই কালীপুজোর বয়স ৪০০ বছর।

প্রামাণিক পরিবার 'সাত ঘর প্রামাণিক' নামে খ্যাত। কার্তিক মাসে অমাবস্যা তিথিতে শ্যামামায়ের পুজো অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রতিপদে কুলদেবতার লৌহযন্ত্রে পুজো হয়, যা 'যন্ত্র পুজো' নামে খ্যাত। সাতঘর প্রামাণিক পরিবারের সদস্যরা পুজোর সাতদিন আগে সবাই মিলে বসে পুজোর অনুষ্ঠান স্থির করেন। পুজোর সাতদিন আগে প্রতিমা বাড়িতে আনা হয়। তারপর পর্যায়ক্রমে রং ও অন্যান্য সামগ্রী দ্বারা সজ্জিত হয়। যখন এই পরিবারের কালীপুজো শুরু হয়, তখন এই বাড়ি ও ঠাকুরদালান ছিল মাটি দ্বারা নির্মিত। আর অঞ্চলটি 'গোবিন্দপুর' নামে পরিচিত ছিল। আগে কালীপুজো উপলক্ষ্যে পশুবলি হতো। ২০০৪ সাল থেকে বলি বন্ধ হয়ে গেছে। এই পুজোয় পরিবারের সদস্য ছাড়াও পল্লির এবং দূরদূরান্তের বহু মানুষ মনস্কামনা পূরণের জন্য মানত করেন। দণ্ডিকাটা, বুকের রক্ত উৎসর্গ করা, ধুনো পোড়ানো ইত্যাদি আজও হয়।

আগে এই বাড়িতে দুর্গাপুজো হতো। কিন্তু যে দুই পূর্বপুরুষ দুর্গাপুজো শুরু করেছিলেন, তাঁদের একজন অসুস্থ হওয়ায় এই পুজো বন্ধ হয়ে যায়। সেই সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায় 'ষোলো আনা' পঙ্‌ক্তি ভোজন ও মোষবলি। কথিত আছে, এই বাড়ির পূজিতা দুই দেবীই খুব জাগ্রতা। জাগ্রতা এই দেবীকে ঘিরে অনেক অলৌকিক ঘটনার কথাও জানা যায়। এরা ব্রাহ্মণ নয়, তাই অন্নভোগ হয় না। পুজোর সাতদিন আগে থেকে সবাই নিরামিষ খান।

আগে, প্রতিমা কাঁধে করে গঙ্গায় নিয়ে গিয়ে দুটি নৌকোর মাঝে রাখা হতো। ধীরে ধীরে দুটি নৌকো দুদিকে সরে যেত এবং প্রতিমা গঙ্গায় নিরঞ্জন হতো। এই বাড়ির পুজোর উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে কালীপুজোর পরদিন বিজয়া দশমীর মতো পরস্পর আলিঙ্গন ও গুরুজনদের প্রণাম করার প্রথা চালু আছে। বাহ্যিক কোনওরকম আড়ম্বর না থাকলেও কালীপুজো অত্যন্ত নিষ্ঠা, ভক্তি ও শুদ্ধাচারে অনুষ্ঠিত হচ্ছে দীর্ঘ ৪০০ বছর ধরে। □

With Best Compliments from :-

SAMRAT SENGUPTA

10/8, Lower Ground Floor
Sarvopriya Vihar
New Delhi - 110065

গুরুভায়ুর মন্দিরের প্রধান পুরোহিত নির্বাচিত হলেন চিকিৎসক কিরণ আনন্দ

বিশেষ প্রতিনিধি।। পেশায় তিনি চিকিৎসক। গত দু'বছর ধরে রাশিয়ার মস্কোয় একটি আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা কেন্দ্র চালান। তিনি ডাঃ কক্কর কিরণ আনন্দ নাম্বুদিরি। ডাক নাম অপ্পু। কেরলের বিখ্যাত গুরুভায়ুরাপ্পা দেবতার মন্দিরে এবার চিকিৎসক কিরণ আনন্দকেই প্রধান পুরোহিত রূপে বেছে নিয়েছেন মন্দির কর্তৃপক্ষ।

কিরণ আনন্দের জন্ম কেরলের গুরুভায়ুরের এক ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ পরিবারে। তাঁদের পরিবারের অনেকেই গুরুভায়ুরাপ্পা মন্দিরের প্রধান পুরোহিত বা মেলশান্তি পদে নিযুক্ত ছিলেন। মেল শান্তি হলেন মন্দিরের প্রধান পুরোহিত যিনি শ্রীশ্রী গুরুভায়ুরাপ্পাদেবের বিশেষ পূজা-অর্চনা পরিচালনার দায়িত্বে থাকেন। কিরণ আনন্দের ঠাকুরদা কক্কদ দামোদরন নাম্বুদিরি পাঁচবার মেলশান্তি পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। কাকা দেবদাসন নাম্বুদিরিও দু'বার এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

ছোটোবেলায় ঠাকুরদা, কাকা ও বাবা কক্কর আনন্দন নাম্বুদিরির কাছে পূজার্চনায়ও নারায়ণ মঙ্গলত নাম্বদিরির কাছে ঋগ্বেদের পাঠ নেয় কিরণ। তারপর কোয়েম্বাটোরের আয়ুর্বেদ ফার্মেসি কলেজ থেকে তিনি ডাক্তারি ডিগ্রি অর্জন করেন। ৬ বছর রাশিয়ায় এবং পরবর্তীকালে দুবাইয়ে তিনি আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করেন। তাঁর উদ্যোগে ভারতে ও বিদেশের মাটিতে ভারতীয় আয়ুর্বেদ শাস্ত্র প্রচার ও প্রসার লাভ করেছে।

পেশাগত জীবনের বাইরে কিরণ আনন্দের আরেক পরিচয় হলো, তিনি সংগীতজ্ঞ। কণ্ঠশিল্পী হিসেবে তাঁর যথেষ্ট সুখ্যাতি আছে। সেই সঙ্গে তিনি মৃদঙ্গ বাদকও। তাঁর ফেসবুক ও ইন্সটাগ্রাম অ্যাকাউন্টে গেলেই দেখা যাবে নানা ভিডিয়ো ক্লিপিংস যেখানে কিরণ ও তাঁর স্ত্রী গান গাইছেন। কিরণের স্ত্রী মানসীও একজন

আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক। ইন্সটাগ্রামে সতেরো হাজারের বেশি ফলোয়ার রয়েছে ডাঃ কিরণের।

সংগীত নিয়ে ডাঃ কিরণ বলেন, 'সংগীত হলো সাধনার অন্যতম মাধ্যম। এর মধ্য দিয়েও আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ ঘটানো সম্ভব। ছোটো থেকেই সংগীত আমার ভীষণ প্রিয়। সংগীত চর্চা করে আমি আমার অবসর সময় কাটাই।' তাঁর এই সংগীত প্রীতির জন্য বেশির ভাগ মানুষই তাঁকে 'সিংগিং ডক্টর' বলে ডাকে। গানবাজনার প্রতি ঝোঁক থাকলেও পারিবারিক পরম্পরা থেকে কোনওদিন বিচ্যুত হননি ডাঃ কিরণ। বরং পরিবারের শিকড়টাকে আরও মজবুত করেছেন। ধর্মীয় সংস্কার, পূজা-যজ্ঞানুষ্ঠানে সমানভাবেই অভিজ্ঞ ও সিদ্ধহস্ত ডাঃ কিরণ বলেন, গুরুভায়ুরাপ্পাদেবের পুজো করলে আমি পরম প্রশান্তি লাভ করি। পূজা বিষয়টা আমার কাছে খুব গভীর একটা বিষয়। কারণ ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের একমাত্র পথই হলো পূজা। তাই প্রথম থেকেই মনস্থির করেছি আমার পেশাগত জীবনের লক্ষ্য বজায় রেখেই নিয়ম ও নিষ্ঠাভরে চিরকাল পুজো করব। এতে কখনও ছেদ পড়বে না।

ছেলেকে নিয়ে গর্বিত কক্কর আনন্দন নাম্বুদিরি বলেন, 'আমার ছেলে মেলশান্তি হওয়ার সুযোগ পাওয়ায় আমি খুব খুশি। ভগবান গুরুভায়ুরাপ্পার আশীর্বাদে আমার ছেলে এই পদের জন্য নির্বাচিত হয়েছে।' কক্কর আনন্দনও একজন পুরোহিত। তবে তিনি কখনও মেলশান্তি নির্বাচিত হননি। তাঁর স্বপ্নপূরণ করলেন ছেলে কিরণ আনন্দ।

গুরুভায়ুর মন্দিরের প্রধান পুরোহিত নির্বাচনের জন্য ৪২ জন আবেদন করেছিলেন। তাদের মধ্যে বাছাই করা ৩৯ জনকে সরাসরি ইন্টারভিউতে ডাকা হয়। তাঁদের মধ্যে বর্তমান মেলশান্তি কৃষ্ণচন্দ্রন নাম্বুদিরি ও তন্ত্রী চেন্নাস দীনাশান নাম্বুদিরি পাদের নির্দেশে নির্বাচিত হন ডাঃ কিরণ আনন্দ। গত ৩০ সেপ্টেম্বরের রাতে মন্দির কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করেন কিরণ। পরবর্তী ৬ মাস তিনিই হবেন গুরুভায়ুর মন্দিরের প্রধান পুরোহিত। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটা ছবি বেশ ঘোরাফেরা করছে। দুবাইয়ের বুর্জ খলিফার সামনে বেইজ স্ট্রাইপড ট্রাউজার পরা, টার্টলড নেকড্ টি-শার্ট পরা ডাঃ কিরণ আনন্দ। দেখে বোঝার জো নেই ইনিই কেরলের বিখ্যাত মন্দিরের প্রধান পুরোহিত। আসলে অশন-বসনে কিছু যায় আসে না। ডাক্তার কিরণ আনন্দ প্রমাণ করেছেন সময়ের তালে পা মিলিয়েও শিকড়ের সংস্কার ধরে রাখা যায়। নিজস্ব পরম্পরাকে বয়ে নিয়ে চলা যায় আবহমানকাল ধরে। □

সাবধান নকল তালমিছরি কিনে ঠকবেন না

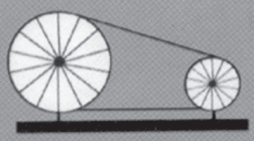

স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও
বাংলার ঘরে ঘরে ছিল
বিশ্বস্ত একটাই নাম

চির পরিচিত
দুলালের®
তালমিছরি

আজও তার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ বাংলার প্রতিটি ঘরেই।
সাধারণ অল্প সর্দি - কাশিতে দুলালের তালমিছরি চুষে
খাওয়াই যথেষ্ট। আর সর্দি - কাশি বেশী হলে একটা
লবঙ্গ ও একটু আদা সহ দুলালের তালমিছরি
এক সঙ্গে ফুটিয়ে চায়ের মতন দু' বার খান
— দারুণ কাজ দেবে।

ভারত সরকারের R ® চিহ্ন দেখে তবেই কিনুন

দুলালের তালমিছরি — সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী

দুলালের তালমিছরি ৪, দত্তপাড়া লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬, ফোন - ২২১৮ ৫৬৭৩, ২২১৮ ০৫৪৩

।। চিত্রকথা।। মহামানব মহানামব্রত।। ১৬।।

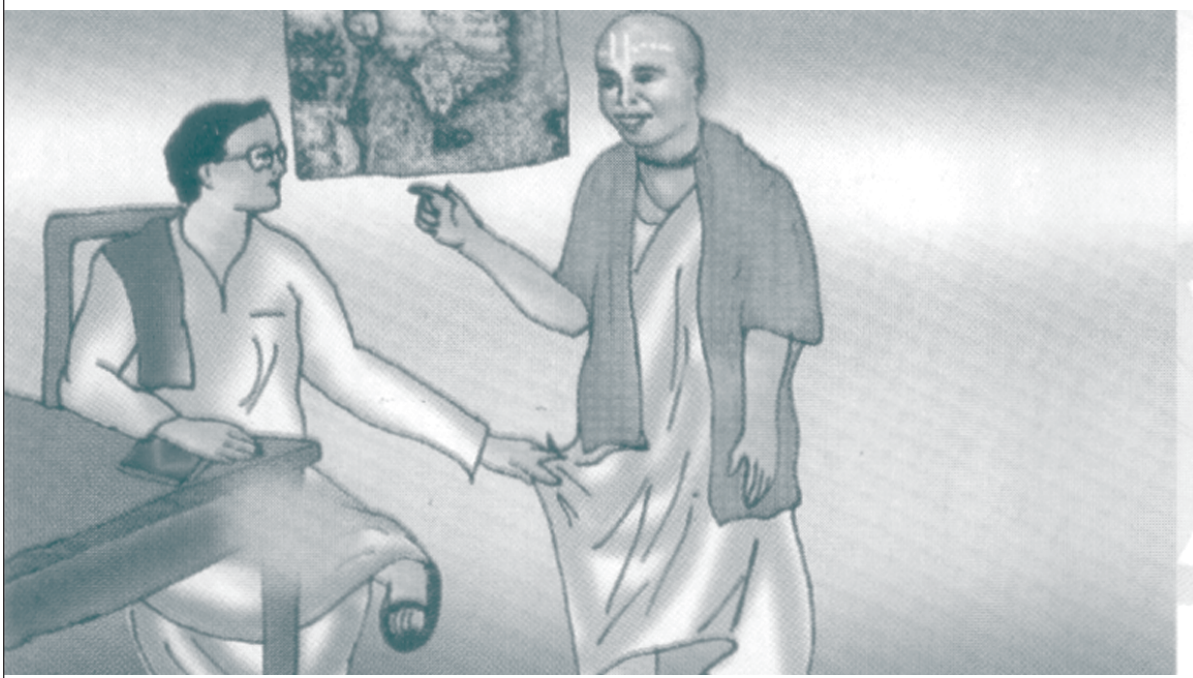

মহানামব্রতজী অধ্যক্ষকে বুঝিয়ে দিলেন বৈরাগীও শুদ্ধ ভক্তি পথেরই সাধক। রামকৃষ্ণ বেশি লেখাপড়া করেননি। কিন্তু একজন বিবেকানন্দ তৈরি করেছিলেন। বিবেকানন্দ যে বলেছেন, 'কটি মাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল ভারতবাসী আমার ভাই'— তবে সে কি মিথ্যা কথা?

ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গনে মহানামব্রতজীকে বহুমুখী সেবার কাজে ব্রতী থাকতে হতো। এর ফাঁকেই চলত পড়াশুনা ও কলেজে যাওয়া।

(ক্রমশ)

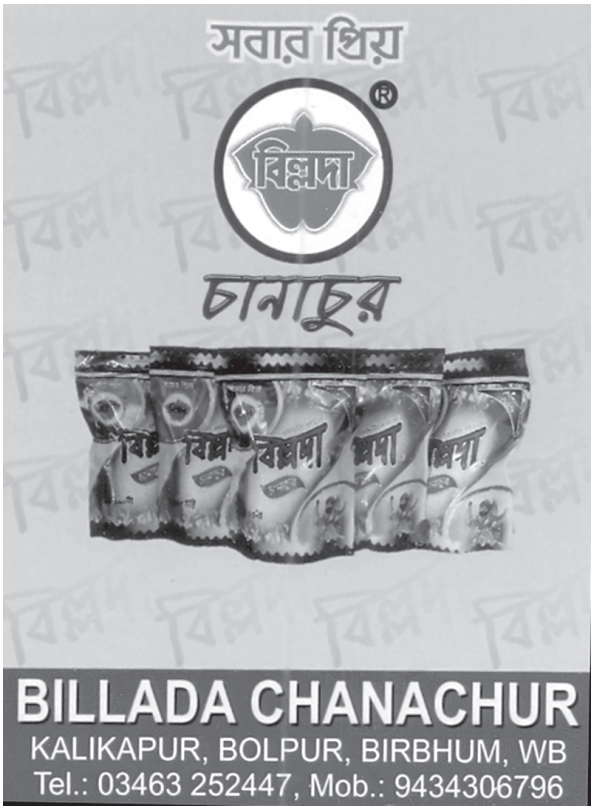

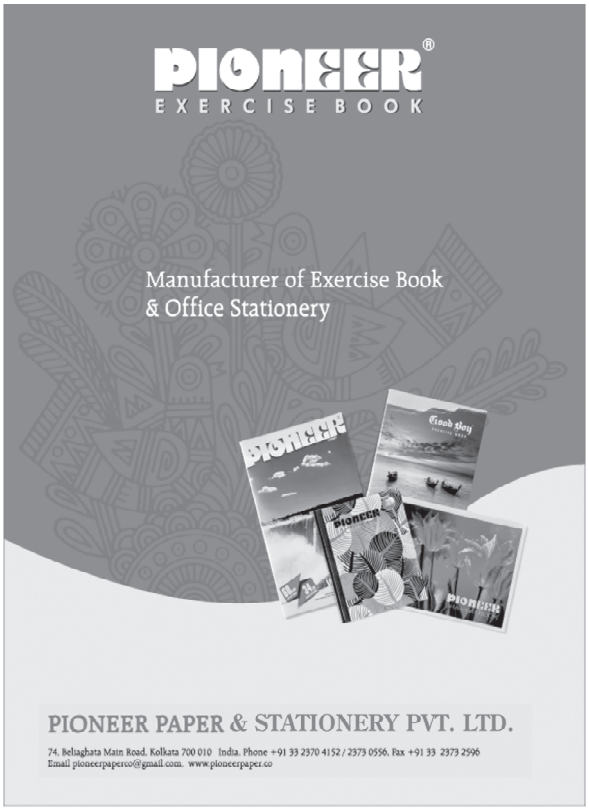

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব
কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

With Best Compliments
from :-

S. Jalan & Company

10, Old Post Office Street
3rd Floor
Kolkata - 700 001

With Best Compliments From :-

EAST INDIA TRANSPORT AGENCY

(A Unit of E.I.T.A. India Limited)

20B, Abdul Hamid Street

4th Foor, Kolkata - 700 069

Phone : Nos. 22483203

Fax No. 22483195

Email : eita.cal@eitain.com

দীপাবলীর শুভেচ্ছা সহ—

SUNITA JHAWAR

Ex কাউন্সিলার ও বিজেপি নেত্রী

৪২ নং ওয়ার্ড, কোলকাতা পুরসভা

KISHAN JHAWAR

উত্তর-পশ্চিম কোলকাতা জেলা সভাপতি

বিজেপি

Mobile : 9830050425

With Best Compliments From :-

Shree Enterprises

(Coal Sales)

Pvt. Ltd.

Coal Merchants &
Commission Agents

32, Ezra Street, Room No. 854,
Kolkata - 700 001

Phone (O) 40086996

With Best Compliments from :

Singhania & Co.

7B, Kiransankar Roy Road

2nd Floor, Kolkata - 1